ওতম্
ঈশ্বরের অস্তিত্বের
বৈজ্ঞানিকতা
('বেদ-বিজ্ঞান আলোকঃ' থেকে উদ্ধৃত)
লেখক - আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক
বৈদিক বৈজ্ঞানিক

মহর্ষি আদ্য ব্রহ্মা থেকে...

...দয়ানন্দ পর্যন্ত আর্ষ পরম্পরা

ওংম্

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিকতা

লেখক - আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

সম্পাদক - য়শপাল আর্য

অনুবাদক - আশীষ আর্য

প্রকাশক - Arya Research Team

"

আমি বেদ বিজ্ঞান দ্বারা এক অখণ্ড, সুখী ও সমৃদ্ধ ভারতকে নির্মাণের আধারশিলা রাখার চেষ্টা করছি, যেখানে প্রত্যেক ভারতীয় তন, মন, বিচারে ও সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ ভারতীয় হবে। তার কাছে নিজের বিজ্ঞান বেদের, ঋষিদের ও দেবগণের প্রাচীন বিজ্ঞানে আধারিত এবং নিজের ভাষা হিন্দি ও সংস্কৃতে হবে। তাদের নিজের পুর্বজদের প্রতিভা, চরিত্র এবং সংস্কারের উপর গর্ভ হবে, তারা পাশ্চাত্য বিদ্বানদের বৌদ্ধিক দাসতা থেকে মুক্তি পাবে, যারদ্বারা লর্ড ম্যাকালের বর্তমানে সফল হয়ে যাওয়া স্বপ্ন ধ্বংস হতে পারবে। এই প্রিয় রাষ্ট্র পুনঃ বিশ্বগুরু হয়ে বিশ্বকে শান্তি এবং আনন্দের মার্গ দেখাবে।

আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

অনুক্রমণিকা

ওতম্

ভূমিকা

আমি ঈশ্বর তত্ত্বের উপর নিষ্পক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা বিচার করে থাকি। আমি বিশ্বের সমস্ত ঈশ্বরবাদীকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, ঈশ্বর নামের কোনো পদার্থ এই সৃষ্টিতে বিদ্যমান আছে কি, নাকি নেই? যেমন কোনো অজ্ঞানী ব্যক্তিও সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, নক্ষত্র, আকাশগঙ্গা, উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের অস্তিত্বের উপর কোনো শঙ্কা করে না, সেরকমই এইসব বাস্তবিক পদার্থের মূল নির্মাতা ও সঞ্চালক ঈশ্বর তত্ত্বের উপর সকল ঈশ্বরবাদী শঙ্কা বা সন্দেহ থেকে মুক্ত কি? সংসারের বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব ও স্বরূপ কোনো আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কি? যদি না হয় তবে এই পদার্থের নির্মাতা যাকে ঈশ্বর বলে মানা হয় তিনি কেন কোনো আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল? আমাদের আস্থা না হওয়াতে কি ঈশ্বর থাকবে না? আমাদের আস্থার দ্বারা সংসারের কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র পদার্থও না তো নির্মাণ হতে পারে আর না আস্থা সমাপ্ত হলে পরে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নষ্ট হতে পারে, তাহলে আমাদের আস্থার দ্বারা ঈশ্বর কিভাবে নির্মাণ হতে পারে আর কেনই বা আমাদের আস্থা সমাপ্ত হলে পরে ঈশ্বর মুছে যেতে পারে? সৃষ্টির কোনো পদার্থের স্বরূপও কি আমাদের আস্থার দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে? যদি না হয়, তবে কেন আমরা নিজের-নিজের আস্থার কারণে ঈশ্বরের রূপ পরিবর্তনের কথা বলে থাকি? সংসারের সকল ভৌতিক ক্রিয়ার বিষয়ে কোথাও কোনো বিরোধ নেই, কোথাও আস্থা, বিশ্বাসের বৈশাখীর আবশ্যকতা নেই, তাহলে কেন ঈশ্বরকে এরকম দুর্বল ও অসহায় বানানো হল, যা আমাদের আস্থাগুলোতে বিভক্ত মানব ও মানবের মাঝে বিরোধ, হিংসা ও দ্বেষকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমরা সূর্যকে একটি মানতে পারি, পৃথিবী আদি লোক, নিজের-নিজের শরীরকে এক সমান স্বীকার করে আধুনিক ভৌতিক বিদ্যাকে মিলেমিশে পড়তে ও পড়াতে পারি, তাহলে কেন আমরা ঈশ্বর আর তার নিয়মকে এক সমান স্বীকার করে পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারি না? আমরা ঈশ্বরের বানানো সৃষ্টি এবং তার নিয়মের উপর বিনা কোনো পূর্বাগ্রহে সংবাদ ও তর্ক-বিতর্ক প্রেমপূর্ণক করে থাকি, তবে কেন এই সৃষ্টির রচয়িতা ঈশ্বর তত্ত্বের উপর কোনো চর্চা, তর্কতে ভয় পাবো? কেন কিঞ্চিৎ মতভেদ হওয়া মাত্রই ফাতওয়া জারী করা হয়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, হিংসায় উদ্যত হয়ে যায়। সৃষ্টির নির্মাতা ঈশ্বর তত্ত্বের অস্তিত্ব কি কারও শঙ্কা ও তর্ক মাত্রতেই কেঁপে উঠবে, মুছে যাবে? যদি ঈশ্বর তর্ক, বিজ্ঞান বা বিরোধী পক্ষের আস্থা ও বিশ্বাস তথা নিজের পক্ষের অনাস্থা ও অবিশ্বাস দ্বারাই মুছে যায়, তাহলে এরকম ঈশ্বরের মূল্যই বা কি হবে? এরকম পরজীবী, দুর্বল, অসহায়, ঈশ্বরের পূজা করে কি লাভ? তাকে কেন মানা হবে? কেন সেই কল্পিত ঈশ্বর আর তার নামে প্রচলিত কল্পিত ধর্মে ব্যর্থ একগুঁয়ে হয়ে ধন, সময় ও শ্রমের অপব্যয় করা হবে?

ঈশ্বরপ্রসূত ভৌতিকীর নিয়ম

আমার প্রবুদ্ধ পাঠকগণ! একটু ভাবুন যে যদি ঈশ্বর নামের কোনো শক্তি বাস্তবে এই সংসারে বিদ্যমান আছে, তবে সে আমাদের বিশ্বাস, আস্থার সাহায্যে জীবিত থাকবে না। সেই শক্তি নিরপেক্ষ রূপে যথার্থ বিজ্ঞান দ্বারা জানার যোগ্যও হবে। তার এক নিশ্চিত স্বরূপ হবে, তার নিশ্চিত নিয়ম হবে। ঈশ্বরের ভৌতিক নিয়মের বিষয়ে Richard P. Feynman বলেছেন -
"We an imagine that this complicated array of moving things which constitutes 'the world' is something like a great chess game being played by the Gods, and we are observed of the game. We do not know what the rules of the games are, all we are allowed to do is to watch the playing. Of course, if we watch long enough, we may eventually watch on to a few rules. The rules of the game are whats we mean by fundamental physics." (Lectures on Physics Pg.13)
এর মানে হল যে এই সংসার নিশ্চিত নিয়মে নির্মিত ও নিশ্চিত নিয়মে চলছে। সেই নিয়ম ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত হয়েছে আর তিনিই তাকে সক্রিয় করে সংসারকে নির্মাণ করেন আর চালনা করেন। বৈজ্ঞানিক সেই অসংখ্য নিয়মের মধ্যে কয়েকটিকে জানতে পারবে মাত্র, তাকে নির্মাণ বা চালনা করতে পারবে না। এখানে ফাইনম্যান একটা বড় ভুল অবশ্য করে দিয়েছেন, সেটা God এর স্থানে Gods লিখে দিয়েছেন। যদি নিয়মের নির্মাতা অনেক Gods হয়, তাহলে নিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে না। সকল Gods কে সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রণকারী কোনো Supreme God অর্থাৎ God এর অস্তিত্ব অবশ্যই মানতে হবে আর মূলভূত ভৌতিক নিয়মের নির্মাতা একটাই God (ঈশ্বর) হবে।

এখন আমরা মনে করি যে সেই God অর্থাৎ ঈশ্বরের ভৌতিক নিয়মই মূলভূত ভৌতিক বিজ্ঞান নামে জানা হয়। এই বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ ভৌতিক বিজ্ঞান, খগোল, রসায়ন, জীব, বনস্পতি, ভূগর্ভ, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সাইন্স আদি সকল শাখাগুলো আশ্রিত। মূলভূত ভৌতিক বিনা সংসারে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। যখন ঈশ্বরের ভৌতিক নিয়ম যারদ্বারা এই সংসারকে জানা যায়, যা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বুদ্ধিবাদী প্রাণী বা মানুষের জন্য সমান, তখন সেই ঈশ্বরকে জানার জন্য আবশ্যকতা তারই নির্মিত আধ্যাত্মিক নিয়ম অর্থাৎ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও (যাকে প্রায়শই ধর্ম বলা হয়ে থাকে) তো সকল মানুষের জন্য সমানই হবে। আশ্চর্যের বিষয় হল যে সাধারণ তর্ক বোঝারও বুদ্ধি ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে আর নেই, তাহলে নিশ্চয়ই এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত ঈশ্বরীয় ধারণা ও কল্পিত উপাসনা - পূজা পদ্ধতিরই ফল, যেখানে সত্য অন্বেষণের বৈজ্ঞানিক মেধা কোথাও পালিয়ে গেছে।

ঈশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিক কেবল Feynman -ই নন বরং অনেক প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন আর করেন। কারণ বর্তমান বিজ্ঞান কেবল প্রয়োগ, প্রেক্ষণ ও গণিতীয় ব্যাখ্যার সাহায্যেই জীবিত আছে আর তার স্বরূপও এটাই। এই কারণে তারা ঈশ্বরের ব্যাখ্যা ইহার দ্বারা না তো করতে পারেন আর না তারা সেই ব্যাখ্যার ইচ্ছা করেন। অন্যদিকে Stephen Hawking তো The Grand Design পুস্তকের মধ্যে যেন বিশ্বের সকল ঈশ্বরবাদীদের মূর্খ মনে করে নিরর্থক ব্যঙ্গ করেছেন। বিজ্ঞানের নাম নিয়ে স্বয়ং অবৈজ্ঞানিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। এই পুস্তকের পূর্বে তারই পুস্তকের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তারপর ধরুন অকস্মাৎ তিনি ভারী খোঁজ করে বিশ্বে ঘোষণা করেছেন যে ঈশ্বর নামের কোনো অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই। অপরদিকে আজ বিশ্বে এরকম ভয়ংকর পাপ প্রবাহ চলছে যে ঈশ্বরবাদী যারা নিজেকে বলছে তারাও এরকম ব্যবহার করছে, যেন তাদের উপর ঈশ্বর নামের কোনো সত্তাই নেই, সেসব অহংকারী মানব স্বয়ংকেই সর্বোচ্চ সত্তার মতো ব্যবহারের প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এই কারণে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অনীশ্বরবাদী ও ঈশ্বরবাদী উভয়কেই আহ্বান করতে চাইবো যে তারা যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর খোলা মন দিয়ে চিন্তা করতে উদ্যত হয়ে যান। আজ অনেক ঈশ্বরবাদী বিদ্বান ঈশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণ দিতে দেখা ও শোনা যায়, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কোনো বৈজ্ঞানিকের দ্বারা নেওয়াটা আবশ্যক মনে করি না। এখন সেই সময় আসবে যখন বর্তমান বৈজ্ঞানিক আমার মতো বৈদিক বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণকে মানা প্রারম্ভ করে নতুন বৈজ্ঞানিক যুগের সূত্রপাত করবে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে মিলে কাজ করবে। আমি আজ সারা বিশ্বের সমস্ত প্রবুদ্ধ সমাজের কাছে ঘোষণাপূর্বক বলতে চাই যে, যদি ঈশ্বর না থাকে, তাহলে সব ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে নাস্তিক ও স্বচ্ছন্দ হয়ে যাও আর যদি ঈশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহলে তার আজ্ঞাতে চলে নির্দিষ্ট জীবনযাপন করার সঙ্গে বিশ্বকে সুখী বানানোর চেষ্টা করো, কারণ সম্পূর্ণ সংসার হল সেই ঈশ্বরেরই রচনা আর এই কারণে সব মানুষই নয় বরং সকল প্রাণীমাত্র পরস্পরের ভাইভাই।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নতুন ভাবে বিচার

এখন আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নতুন ভাবে বিচার করবো -
আমরা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের নিকট যেসব চর্চাই সৃষ্টি বিজ্ঞানের উপর করেছি, সেসব থেকে একটি বিচার এটা সামনে আসে যে বৈজ্ঞানিক "কেন" প্রশ্নের উত্তর দেয় না কারণ তাদের দৃষ্টিতে এটা বিজ্ঞানের বিষয় নয়। আমরা বিশ্বের মধ্যে নানা স্তরে নিম্ন প্রশ্নবাচক শব্দের সম্মুখ হয়ে থাকি -
১. কেন
২. কে
৩. কার জন্য
৪. কি
৫. কিভাবে ইত্যাদি
এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে "**কি**", "**কিভাবে**" এর উত্তরের বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান বিচার করার চেষ্টা করছে মনে হচ্ছে। যদিও এই উভয় প্রশ্নেরও পূর্ণ সমাধান তো বিজ্ঞানের কাছে নেই কিন্তু প্রচেষ্টা অবশ্য নিষ্ঠাপূর্বক হচ্ছে। অন্য প্রশ্ন "**কি**", "**কে**" এবং "**কার জন্য**" এই তিন প্রশ্নের বিষয়ে বিচার করাও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য কিঞ্চিৎ রুচির বিষয় নয়। আমরা এই প্রশ্নের অভিপ্রায়ে ক্রমশঃ বিচার করবো -

কেন - এই প্রশ্ন প্রয়োজনের খোঁজের জন্য প্রেরিত করে। আমরা অবশ্যই সারা জীবন ধরে নানা প্রকারের কর্ম করে থাকি এবং নানা দ্রব্যের সংগ্রহ করি। এসবের কোনো না কোনো প্রয়োজন অবশ্যই থাকে। যেকোনো বুদ্ধিমান প্রাণী কোনো না কোনো প্রয়োজন হেতুই প্রবৃত্তি রেখে থাকে। মূর্খ মানুষ যদিও বা নিষ্প্রয়োজন কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তি রাখতে পারে, বুদ্ধিমান তো কখনও এরকমটা করবে না। বিশ্বের উপর বিচার করুন যে এটা কেন নির্মিত হয়েছে আর কেন সঞ্চালিত হচ্ছে? এটির প্রত্যেক গতিবিধির কোনো না কোনো প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। "**কেন**" প্রশ্নটির উপেক্ষাকারী কোনো বৈজ্ঞানিক কি এটা বলতে পারবে যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড নিষ্প্রয়োজনে রচনা হয়েছে? আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষকে সর্বপ্রথম "**কেন**" প্রশ্নটির উত্তরই খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। যেরকম কেউ কোনো কর্ম করার পূর্বে তার প্রয়োজন জানে, সেরকম এই সৃষ্টির উৎপত্তি হওয়া, কোনো শরীরধারীর জন্ম নেওয়ার প্রয়োজনটাকে জানারও চেষ্টা করা উচিত। বর্তমান বিজ্ঞান এই প্রশ্নের থেকে দূরে থাকার কারণেই আজ সেটা অনেক অনুসন্ধান করার পরেও তার উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুষ্প্রভাবের উপর বিচার করছে না। এই কারণে মানবকে নিজের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, এমনকি বেঁচে থাকার প্রয়োজনেরও জ্ঞান না থাকায় ভোগের অতি তৃষ্ণাতে বিচরণ করে অশান্তি ও দুঃখের জালে ফেঁসে যেতে হচ্ছে।

কে - এই প্রশ্নটি "**কেন**" এর সঙ্গে যুক্ত। কোনো কাজ কি প্রয়োজনের জন্য হচ্ছে, এর সাথেই এরসঙ্গে যুক্ত থাকা অন্য প্রশ্ন এটাও উৎপন্ন হয় যে, কে সেই কাজটিকে সম্পন্ন করেছে অথবা কে সম্পন্ন হচ্ছে অর্থাৎ তার প্রয়োজনটা কি? এই সৃষ্টির প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি নিশ্চিত প্রয়োজন রয়েছে, সঙ্গে তার প্রযোজক কোনো চেতন তত্ব রয়েছে। কোনো জড় পদার্থ প্রযোজক হয় না। জড় পদার্থ প্রয়োজনের সামগ্রী তো হতে পারে কিন্তু তার কর্তা অর্থাৎ প্রযোজক নয়। চেতন তত্বই জড় তত্বের উপর সাম্রাজ্য ও নিয়ন্ত্রণ করে। চেতন তত্ব স্বতন্ত্র হওয়ায় কর্তাপনের অধিকারী হবে, অন্যদিকে জড় পদার্থ স্বতন্ত্র না হওয়ায় কর্তৃত্ব সম্পন্ন হতে পারবে না।

কার জন্য - এই প্রশ্ন এই কথার বিচার করে যে, কোনো কর্তা কোনো কর্ম করেছে বা করছে, তো সে কর্ম কি নিজের জন্য করেছে বা করছে অথবা অন্য কোনো চেতন তত্বের জন্য করছে? এখানে কোনো উপভোক্তা হবে আর উপভোক্তাও কেবল চেতনই হয়ে থাকে। জড় পদার্থ কখনও না তো নিজের উপভোগ করতে পারে আর না সে অন্য জড় পদার্থের উপভোগ করাতে পারে।

কি - এই প্রশ্ন পদার্থের স্বরূপের পূর্ণতঃ ব্যাখ্যা করে। জগৎ কি? এর স্বরূপ কি? মূল কণা কি? ঊর্জা ও দ্রব্য কি? বল কি? এইসব প্রশ্নের সমাধান হল এই ক্ষেত্রের বিষয়। বর্তমান বিজ্ঞান তথা দর্শন শাস্ত্র উভয় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করে থাকে। এর ক্ষেত্র অধিক ব্যাপক। বর্তমান বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে সমর্থ নয়। যেখানে বিজ্ঞান অসমর্থ হয়ে যায়, সেখানে বৈদিক বিজ্ঞান কিংবা দর্শন শাস্ত্র এর উত্তর দিয়ে দেয়।

কিভাবে - যেকোনো ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়? জগৎ কিভাবে নির্মাণ হয়েছে? দ্রব্য ও ঊর্জা কিভাবে ব্যবহার করে? বল কিভাবে কাজ করে? এইসব প্রশ্নের সমাধান হল এই ক্ষেত্রের বিষয়। বর্তমান বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে কাজ করে কিন্তু এটিরও পূর্ণ সন্তোষপ্রদ উত্তর তার কাছে নেই। অন্য প্রশ্নগুলো না জেনে এটির সন্তোষপ্রদ উত্তর পাওয়াও যাবে না।

এই পাঁচটি প্রশ্নের অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রশ্নও রয়েছে, যাদের সমন্বয় এই পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যেই প্রায় হতে পারবে।

এখন আমরা সৃষ্টি উৎপত্তির প্রেক্ষাপটে কেন ও কে প্রশ্নের উপর ক্রমশঃ বিচার করবো -

Big Bang Theory এর প্রেক্ষাপটে -

পূর্বোক্ত Big Bang Theory তে অনেক প্রশ্ন নিম্নানুসার উপস্থিত হয়েছে -

• অনন্ত সঘন ও অনন্ত তাপযুক্ত শূন্য আয়তনকারী পদার্থের মধ্যে অকস্মাৎ বিস্ফোরণ কেন হল তথা একে কে করেছে?

• যদি Steven Weinberg এর Big Bang এর উপর বিচার করা হয়, তাহলে সেখানেও কেন ও কে প্রশ্ন উপস্থিত হবেই। যদি চেতন নিয়ন্ত্রক সত্তাকে স্বীকার করা যায়, তবে বলা যেতে পারে যে সে করেছে আর জীবদের ব্যবহারে আসার যোগ্য বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সৃষ্টির নির্মাণ করার জন্য বিস্ফোরণ করে কিন্তু অনীশ্বরবাদী এটির উত্তর কখনও দিতে পারবে না। এক বৈজ্ঞানিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে যদি ঈশ্বরকে মানা হয়, তবুও এই প্রশ্ন উঠবে যে ঈশ্বর অকস্মাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩.৬ অর্ব বর্ষ পূর্বেই কেন বিস্ফোরণ করে? তো এটির উত্তরে ঈশ্বরবাদী তো উচিত উত্তর দিতে পারবে। চেতন তত্ব ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সে কোনো কাজের সময় ও প্রয়োজন নিজের বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত করতে পারে। কোনো পাখি বৃক্ষ থেকে অমুক সময়ে কেন উড়ে গেল? আমি অমুক সময়ে অমুক কাজ কেন করেছি? আমি খিদে পেলে ভোজন করবো নাকি করবো না, এটা আমার ইচ্ছা ও বিবেকের বিষয় হবে, এখানে "কেন" প্রশ্ন উচিত হবে না কিন্তু বৃক্ষ থেকে পাতা কেন পড়েছে? এখন বৃষ্টি কেন হচ্ছে? জল নিচের দিকে কেন বইছে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেওয়ার যোগ্য হবে, কারণ এখানে ইচ্ছা এবং বিবেক নেই।

এই কারণে ঈশ্বরবাদী Big Bang এর সময় ও প্রয়োজনের ন্যায্যতাকে সিদ্ধ করতে পারে, অনীশ্বরবাদী কখনও করতে পারবে না। আমার বলার প্রয়োজন এটা নয় যে ঈশ্বর দ্বারা Big Bang হওয়া সম্ভব অর্থাৎ যদি Big Bang Theoriest ঈশ্বরের সত্তাকে মেনে নেয়, তবে Big Bang Theory সত্য হতে পারে। কিন্তু না, ঈশ্বর তত্বটিও বর্তমান বৈজ্ঞানিকতার Big Bang -কে সম্পন্ন করতে পারবে না। Big Bang কিভাবে হয়? এটির সমাধান ঈশ্বরবাদ দ্বারাও হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরও নিজের নিয়মের অর্থাৎ মূলভূত ভৌতিকীর নিয়মের বিরুদ্ধ কাজ করতে পারে না। আমি Big Bang থিওরীর সমীক্ষাতে দেখিয়েছি যে এই থিওরীতে ভৌতিকীর কত মূলভূত নিয়মের উলঙ্ঘন রয়েছে? (Big Bang এর উপর আচার্য জীর সমীক্ষা আপনি বেদ বিজ্ঞান আলোক গ্রন্থে পড়তে পারেন বা Vaidic Physics YouTube Channel এ ভিডিও দেখতে পারেন যথা - https://youtu.be/XMYeIKrmRWo)

হ্যাঁ, যদি কোনো লোকে বিস্ফোরণ মানা যায়, সেই লোকটিও অনাদি না মানা হয়, সঙ্গে ভৌতিকীর পূর্বোক্ত নিয়মের উলঙ্ঘন না হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বর দ্বারা বিস্ফোরণ করা যেতে পারে কিন্তু সেই একটি বিস্ফোরণেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ হওয়াটা সম্ভব নয়। শূন্য থেকে ঈশ্বরও সৃষ্টির রচনা করতে পারবে না। সৃষ্টি রচনার জন্য অনাদি জড় উপাদান কারণের আবশ্যকতা অবশ্যই হবে কিন্তু জড় পদার্থে স্বয়ং গতি, ক্রিয়া হয় না, এই কারণে এদের উৎপন্ন করতে ঈশ্বরের ভূমিকা অবশ্যই হবে। অনন্ত পদার্থ (অনন্ত তাপ অনন্ত দ্রব্যমান) দ্বারা সীমিত উর্জা ও সীমিত দ্রব্যমানকারী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কেন হয়? এর উত্তর

অনীশ্বরবাদী দিতে পারবে না, অপরদিকে ঈশ্বরবাদী এটির উত্তর দিয়ে বলতে পারে যে ঈশ্বর তার নিজের প্রয়োজনানুসার অনন্ত পদার্থ দ্বারা কিছু পদার্থকে ব্যবহারে নিয়ে এসে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করতে পারে। যেভাবে জনগণের মাঝে কোনো ব্যক্তি পদার্থ বিশেষ দ্বারা কিছু ভাগ নিয়ে নিজের ইচ্ছার প্রয়োজনানুসার কোনো বস্তু বিশেষের নির্মাণের জন্য স্বতন্ত্র, তার ইচ্ছা বা প্রয়োজনের উপর কোনো অন্য ব্যক্তি প্রশ্ন উপস্থিত করতে পারবে না, সেই ভাবে অনন্ত পদার্থ দ্বারা কিছু পদার্থকে নিয়ে পরমাত্মা সীমিত দ্রব্যমান ও ঊর্জাকারী ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করে থাকে। আমরা এর উপর এই প্রশ্ন করতে পারবো না যে তার অনন্ত পদার্থের শেষ ভাগের ব্যবহার কেন করেনি অথবা অনন্ত দ্রব্যমান বা ঊর্জা দ্বারা যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড কেন নির্মাণ করেনি? তাছাড়া এখন তো এই প্রশ্নটিও অনুত্তরিত যে ব্রহ্মাণ্ড সীমিত নাকি অনন্ত? আমাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অপেক্ষায় সীমিত তথা আমাদের অপেক্ষায় অনন্ত। আমরা যে পদার্থকে এরকম মনে করি যে সেটি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণে কাজে লাগেনি, সেটা আমাদের অল্পজ্ঞতাই হবে। বস্তুতঃ যে পদার্থটি এরকম সেটিও ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালন আদিতে পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সে পদার্থই প্রাণ, মন, ছন্দ ও মূল প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় কথা এটাও যে প্রারম্ভে দ্রব্যমান, ঊর্জার মতো লক্ষণ বিদ্যমানই হয় না।

• দূরে ছড়িয়ে যাওয়া পদার্থ সংঘনিত হওয়া কিভাবে প্রারম্ভ করে? অনীশ্বরবাদী দূরে ছুটতে থাকা পদার্থের সংঘনিত হওয়ার যথার্থ কারণ বলতে পারবে না কিন্তু ঈশ্বরবাদী এটির এইভাবে সমাধান করতে পারে যে দূরে ছুটতে থাকা পদার্থকে ঈশ্বর সৃষ্টি সৃজন হেতু তার সূক্ষ্ম তরঙ্গ রূপ শক্তিশালী পদার্থ দ্বারা অবরোধ করে সংঘনিত করতে পারে অর্থাৎ সংঘননের প্রক্রিয়া প্রারম্ভ করতে পারে।

Eternal Universe

এই মতের উপর আমি একমাত্র প্রশ্ন এটা তুলে ছিলাম যে যেকোনো কণা বা ক্বান্টা, যারমধ্যে কোনো প্রকারের বল অথবা ক্রিয়া বিদ্যমান হবে, সেটা অনাদি হতে পারবে না। সঙ্গে আমি এটাও বলেছি যে, যে পদার্থ কোনো অন্য সূক্ষ্মতর পদার্থের সংযোগ দ্বারা নির্মাণ হয়েছে, সেটা অনাদি হতে পারবে না। এটির কারণও আমি এই সিদ্ধান্তের সমীক্ষার সময়ে বলে দিয়েছি। এখন আমরা সৃষ্টির অনাদিত্বের উপর কিছু অন্য পদ্ধতি দ্বারা বিচার করবো। গতি কি অনাদি? - "**সৃষ্টি**" শব্দের অর্থ হল - "নানা পদার্থের বুদ্ধিপূর্বক - মিশ্রণ দ্বারা নতুন-নতুন পদার্থের উৎপত্তি হওয়া", এই মিশ্রণের ক্রিয়াতে বল আর গতি হওয়াটা অনিবার্য। প্রশ্ন হল এটা যে, জড় পদার্থের মধ্যে কি স্বয়ং বল অথবা গতি হওয়া সম্ভব? এই সৃষ্টিতে যা যা বল ও গতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেসব কি মূলতঃ তাদের নিজেরই? এই বিষয়ে মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন **"প্রবৃত্তেশ্চ (অনুপপত্তেঃ)"** (ব্র০সূ০ ২|২|২) অর্থাৎ জড় পদার্থের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো ক্রিয়া ও গতি আদি হতে পারে না। তারমধ্যে গতি ও ক্রিয়াকে উৎপন্নকারী কোনো চেতন তত্ব অবশ্য হয়ে থাকে। আমরা আমাদের চতুর্দিকে নানা প্রকারের গতিগুলো নিরন্তর দেখি, যারমধ্যে কয়েকটি বস্তুর গতির দাতা চালক দেখা যায়, তো কয়েকটির গতির চালক দেখা যায় না। এখন আমরা বিচার করবো যে, কোন-কোন পদার্থ আছে যাদের

চালক দেখা যায় না আর কোন-কোন পদার্থ এরকম আছে যাদের চালক দেখা যায়, কিংবা দেখা যেতে পারে। আমরা শুধু রেলগাড়ী, গাড়ি আদির বাহনের চালককে প্রত্যক্ষ দেখে থাকি, তাদের ইচ্ছা বা চেষ্টা আদি ক্রিয়াগুলোর অনুভব করে থাকি। আমরা বাহনের গতিকে প্রারম্ভকারী চেতন বাহন চালককে দেখি কিন্তু বাহনের ইঞ্জিনের মধ্যে হতে থাকা ক্রিয়াগুলোকে মাত্র জ্বালানী দ্বারা উৎপন্ন মেনে নেই। জ্বালানী বা তারদ্বারা উৎপন্ন ঊর্জা বাহনকে কিভাবে গতি দেয়, বিদ্যুৎ বড়-বড় যন্ত্রকে কিভাবে চালায়, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল কিভাবে কাজ করে, ঊর্জা ও বল কি? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের নেই। বর্তমান বিজ্ঞানও এই কথাকে স্বীকার করে। Richard P. Feynman লিখেছেন -
"It's important to realise that in physics today, we have no knowledge of what energy is." (Lectures on Physics- P. 40)
"If you insist upon a precise definition of force you will never get it." (id. P. 147)
"Why things remains in motion when they are moving or why there is a law of gravitation was, of course not known." (id. P. 15)

এরদ্বারা এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞান বল এবং ঊর্জাকে ঠিক -ঠিক বুঝতে পারছে না। সেটি কিভাবে কাজ করে, এটা অজ্ঞাত। সূক্ষ্ম পরমাণু অণু অথবা তরঙ্গ কিভাবে একটানা চলছে? এটাও সর্বদা অজ্ঞাত। Feynman এর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ বর্তমান বিজ্ঞানের কার্যশৈলীর একটা সীমা রয়েছে। Science শব্দের অর্থ করে Chambers Dictionary তে লেখা আছে যে -
"Knowledge ascertained by observation and experiment, critically tested, systematized and brought under general principles, esp in relation to the physical world, a department or a branch of such knowledge or study."
Oxford advanced learners dictionary -র Indian Edition এর মধ্যে Science এর অর্থ এইভাবে করেছে-
"Organised knowledge esp when obtained by observation and testing of facts, about the physical world, natural laws."

এই উভয় পরিভাষার দ্বারা এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে ভৌতিক জগতের যে জ্ঞান প্রয়োগ, প্রেক্ষণ আর বিবিধ পরীক্ষণের দ্বারা তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থীত হয়ে থাকে, সেটা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমানাতে মানা হয়। এর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, আমাদের কাছে পরীক্ষণের যত অধিক সাধন উপলব্ধ হবে, আমাদের বিজ্ঞান তত অধিক পরীক্ষণ করে সৃষ্টির পদার্থকে জানতে পারবে। নিজের টেকনিক্যাল সাধনের সীমার বাইরে যেকোনো পদার্থ, সেটা যত যথার্থই হোক না কেন, তাকে বিজ্ঞান স্বীকার করে না। পশ্চিমী দেশের বিজ্ঞানে আইজ্যাক নিউটনের পূর্বে গুরুত্বাকর্ষণ বলের জ্ঞান ছিল না, গ্যালিলিও এবং কোপারনিকাসের পূর্বে পৃথিবীর আকার ও

পরিক্রমণের জ্ঞান ছিল না, ততক্ষন তাদের জন্য গুরুত্বাকর্ষণ বল, পৃথিবীর গোলাকৃতি হওয়া তথা সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করা আদি বিষয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে আসতো না অর্থাৎ এইসকল তথ্য কল্পনামাত্র ছিল। কিন্তু যখন এই বৈজ্ঞানিকগণ এসবের উপর প্রেক্ষণ ও প্রয়োগ করে, তো এসব তথ্য বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আজ সংসারে যা যা নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তা আজকের পূর্বে কল্পনার বিষয় ছিল কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও টেকনিক হয়েছে। এই কারণে বলা হচ্ছে যে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। এটিকে বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষত্ব বলা হবে নাকি অপূর্ণতা, এটা বৈজ্ঞানিকদের স্বয়ং ভাবা উচিত।

আমি সূর্যকে দেখতে পারবো কিনা, এটিতে সূর্য আর তার বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না, তাহলে আমি এটিকে নিজের প্রেক্ষণের ও প্রয়োগের সীমার মধ্যে কঠোরতাপূর্বক কেন বেঁধে রাখার জিদ করবো? স্থূল রূপে জ্ঞানের দুটো ক্ষেত্র রয়েছে। একটি হল, যার প্রেক্ষণ ও প্রয়োগের টেকনিক বর্তমানে উপলব্ধ আছে, দ্বিতীয় হল, যার প্রয়োগ ও পরীক্ষণের টেকনিক মনুষ্য দ্বারা বিকশিত করার সম্ভাবনা হতে পারে। এর অতিরিক্ত জ্ঞানের এক ক্ষেত্র এরকমও আছে যার প্রয়োগ ও পরীক্ষণ কোনো টেকনিক দ্বারা সম্ভব নয়, বরং যাকে য়োগ সাধনাজন্য দিব্যদৃষ্টি দ্বারাই জানা যেতে পারে। এই তিন প্রকারের জ্ঞানের মধ্যে উচিত তর্ক হওয়াটা অনিবার্য হবে। যে কথা সামান্য সুতর্ক তথা ঊহার দৃষ্টি দ্বারাও অসম্ভব মনে হবে, সেটি উপরোক্ত তিন প্রকারের জ্ঞানের মধ্যে একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রতেও আসবে না। এখানে ঊহা ও তর্কের যথার্থ অভিপ্রায়ও গম্ভীর বিচারকই জানতে পারবে, সামান্য ব্যক্তি নয়। যে যে ব্যক্তির প্রতিভা, সাধনা যার-যার অধিক হবে, তার-তার তর্ক ও ঊহা শক্তি তত অধিক যথার্থ হবে। এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞানকে তার নিজের সীমানার বাইরে গিয়ে সুতর্ক ও ঊহার দৃষ্টি দ্বারাও বিচার করা উচিত। যদি কোনো সজ্জন এটা বলে যে সুতর্ক ও ঊহা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো মহত্ব নেই, আমি সেই সজ্জনকে বলতে চাইবো যে, বিজ্ঞানের জন্ম সুতর্ক এবং ঊহা দ্বারাই হয়ে থাকে আর যেখানে বিজ্ঞানের সামর্থ্য বা সীমানা সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে তার সমাপ্তি সুতর্ক ও ঊহা রূপ দর্শনের মধ্যেই হয়ে যায় কিংবা বিজ্ঞানের চরম সীমার পরে দর্শনের সীমা পুনঃ প্রারম্ভ হয়ে যায়।

দর্শন ও বৈদিক বিজ্ঞান

যখন নিউটন আপেলকে নিচে পড়তে দেখেন, সেসময় তার মনে এই উহা ও তর্কের উৎপত্তি হয় যে আপেল নিচেই কেন পড়েছে? তার এই ভাবনা দ্বারা গুরুত্বাকর্ষণের খোঁজ আর এতদর্থ করা প্রয়োগ, পরীক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য ভিত্তি স্থাপন করা হয়। আপেল পড়তে অনেকেই দেখেছে বা সেই সময়ও দেখতো কিন্তু এই ভাবনা নিউটনের মস্তিষ্কেই আসে, কারণ তিনি তর্ক ও উহা দ্বারা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। দর্শনকে ইংরেজি ভাষায় Philosophy বলা হয়, যার পরিভাষা করে Chambers Dictionary তে লেখা আছে যে -
"In pursuit of wisdom and knowledge, investigation contemplation of the nature of being knowledge of the causes and laws of all things. The principles Underlying any sphere of knowledge, reasoning."

Oxford Advanced Learners Dictionary তে এটিকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে -
"Search for knowledge and understanding of the nature and meaning of the Universe and human life."

আজ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান বিভিন্ন বস্তুর, তার কারণ তথা কার্য করার সিদ্ধান্ত আদিকে তর্ক ও উহার আধারে জানার চেষ্টা করাকেই দর্শন বলা হয়। এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়ের উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মাণ্ডকে জানার চেষ্টা করা। উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ভেদ রয়েছে অবশ্য কিন্তু উভয়ের উদ্যেশ্যটি হল সমান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মানব টেকনিকের সামর্থ্য পর্যন্ত সীমিত আর দর্শনের ক্ষেত্র চিন্তন, মনন, উহার সীমানাগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ আদি কর্মের বিদ্যমানতার মধ্যেও মূল কারণ বা নিয়মাদি বিষয়ের মধ্যে বিভ্রান্ত হতে পারে, তো কখনও দর্শনও দার্শনিকগণের (বিশেষ করে পরম সিদ্ধ য়োগীদের বাদ দিলে) কল্পনার স্রোতে বয়ে ভ্রান্ত হতে পারে। আমাদের উভয় পদ্ধতিতেই বিবেক সম্মত ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। এখন আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনের সীমা আর সমন্বয়কে দেখানোর সঙ্গে সৃষ্টির একটি নিয়মের উপর বিচার করবো। যখন আমরা এটার উপর চিন্তন করি যে এক ধনাবেশিত বস্তু অপর ঋণাবেশিত বস্তুকে কেন আকর্ষিত করে? তখন এই জ্ঞানের প্রক্রিয়াতে সর্বপ্রথম আমাদের এটা অনুভব হয় যে বিপরীত আবেশকারী কোনো বস্তুও একে অপরকে আকর্ষিত করে। এখানে আকর্ষণ বল রয়েছে, তো সেটির কারণও হবে, এটা চিন্তন করা দর্শনের ক্ষেত্র। কোনো দুটি বস্তু পরস্পর নিকট আসছে, তখন তার মাঝে কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে থাকবে, এটা জানাও দর্শনের ক্ষেত্র। এখন সেই আকর্ষিত হতে থাকা বস্তুর উপর বিপরীত বৈদ্যুত্ আবেশ রয়েছে, এটা বলা বিজ্ঞানের কাজ। এই আবেশ কিভাবে কাজ করে? এটা বলাও বিজ্ঞানের কাজ। বর্তমান বিজ্ঞান জেনেছে যে যখন দুটি বিপরীত আবেশকারী কণা যখন নিকটে

আসে, তখন তাদের মাঝে Virtual Photons উৎপন্ন আর সঞ্চারিত হতে থাকে। এই Particles (Photons) -ই আকর্ষণ বলের কারণ হয়। এই Particles বর্তমান বিজ্ঞানের মতে সেই দুই কণার মাঝে বিদ্যমান Space -কে সংকুচিত করে সেই কণাকে পরস্পর নিকটে নিয়ে আসার কাজ করে। এই প্রক্রিয়াকে জানা বিজ্ঞানের কাজ। যদিও বিজ্ঞানের সীমা এখানে সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এরপর দর্শন বা বৈদিক বিজ্ঞানের সীমা প্রারম্ভ হয়ে যায়।

যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে, ধন ও ঋণ বৈদ্যুত আবেশযুক্ত কণার পরস্পর নিকটে আসতেই Virtual Particles কোথা থেকে ও কেন প্রকট হয়ে যায়? তখন বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয় যে এটির উত্তর আমরা জানি না। যেখানে বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে উত্তর পাওয়া যায় না, সেখানে বৈদিক বিজ্ঞান বা দর্শন উত্তর দিয়ে দেয়। এই উত্তর বৈদিক ঋষিদের বা বেদের মহান বিজ্ঞান দ্বারা পাওয়া যাবে, যাকে আমরা কোনো পৃথক্ পুস্তকে স্পষ্ট করবো। এখানে আমি বলতে চাই যে, বর্তমান বিজ্ঞান কোনো বল -এর কাজ করার প্রক্রিয়াকে বলে থাকে, অপরদিকে বৈদিক বিজ্ঞান কিংবা দর্শন তারও আগে এগিয়ে গিয়ে বলে দেয় যে সেই বলটির প্রক্রিয়া কেন হচ্ছে আর মূল প্রেরক বলটি কি? সেখানে আমরা এটা সিদ্ধ করবো যে সকল জড় বলের মূল প্রেরক বলটি হল চেতন পরমাত্মা তত্ত্বের বল। এখানে বর্তমান বিজ্ঞান না তো আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয় আর না ঈশ্বর তত্ত্বের মূল প্রেরক বলটির সত্তাকে স্বীকার করে। এরকম দুরাগ্রহ কোনো বৈজ্ঞানিকের জন্যই উচিত নয়। তাকে হয় সমস্যার সমাধান করা উচিত অথবা বৈদিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট সমাধান জিজ্ঞেস করা উচিত।

এখানে আমরা চর্চা করছিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত মূলকণা অনাদি হতে পারবে না আর তাই তাতে হওয়া যেকোনো প্রকারের ক্রিয়া বা গতিও অনাদি হতে পারবে না। এখন যদি কেউ এখানে জিদ করে বলে যে, মনে করুন যে মূলকণা প্রাণাদি সূক্ষ্ম পদার্থ বা প্রকৃতি রূপ সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা নির্মাণ হয়েছে, তবুও সেই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম কারণ পদার্থের মধ্যে গতি অনাদি কেন হতে পারবে না? কেন এটির জন্য চেতন ঈশ্বর তত্ত্বের আবশ্যকতা হবে?

এই বিষয়ে আমি এইভাবে বিচার করি যে -
এই সৃষ্টিতে যেসব গতি এবং বলের অস্তিত্ব রয়েছে, সেটা পদার্থের সূক্ষ্মতম অবস্থা পর্যন্ত প্রভাবী হবে। পদার্থের অণুতে হওয়া যেকোনো ক্রিয়া, বল আদির প্রভাব তাতে বিদ্যমান আয়ন্স পর্যন্ত হয়ে থাকে। আয়ন্সের মধ্যে হতে থাকা প্রত্যেক গতি ও বল আদির প্রভাব বা সম্বন্ধ ইলেকট্রন্স, প্রোটন্স, নিউট্রন্স বা ক্বার্স ও গ্লুআন্স পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, বর্তমান বিজ্ঞানও এটিকে মিথ্যা বলবে না। এই সূক্ষ্ম কণার গঠন ও স্বরূপের বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ, এই কারণে এতে হওয়া গতি, ক্রিয়া, বল আদির প্রভাবের ব্যাপকতার বিষয়ে তারা অনভিজ্ঞ। এই প্রভাব প্রাণ, মন ও বাক্ তত্ত্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, যা

মূল প্রকৃতি ও ঈশ্বরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ ঈশ্বর তত্ত্বটিতে কোনো ক্রিয়া হয় না আর প্রকৃতিতে ক্রিয়া ঈশ্বরীয় প্রেরণা দ্বারা হয়ে থাকে, কিন্তু তারফলে প্রকৃতির মূল স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইসব জ্ঞান বর্তমান বিজ্ঞান বা টেকনিক দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। গতি ও বলের ব্যাপ্তির পশ্চাৎ আমরা এটাও বিচার করবো যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে হতে চলা প্রত্যেক ক্রিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা হচ্ছে। সমস্ত সৃষ্টি অনায়াস কোনো ক্রিয়ার পরিণাম নয়, বরং প্রত্যেক ক্রিয়া অত্যন্ত পদ্ধতিগতভাবে ও বিশেষ প্রয়োজনানুসার হচ্ছে। মূলকণা, ক্বান্টা আদি সূক্ষ্ম পদার্থ কিংবা বিভিন্ন বিশাল লোক লোকান্তর আদি পদার্থ জড় হওয়ার কারণে না তো বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ক্রিয়াগুলো করতে পারে আর না তারা নিজের ক্রিয়ার প্রয়োজনও বুঝতে পারে। Stephen Hawking, যিনি তার নিজের পুস্তক "The Grand Design" এ ঈশ্বরের সত্তাকে নিজের অবৈজ্ঞানিক কুতর্ক দ্বারা অস্বীকারের অসফল চেষ্টা করেছেন, সেখানে শরীরে জীবাত্মার সত্তাকেও অস্বীকার করার অসফল চেষ্টা করেন। তিনি তারমধ্যে রোবট এবং পরগ্রহী জীবের মধ্যে ভিন্নতা করেন, তারপরও পরগ্রহী জীবে স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মাকে মানেন না। এই জিদটাই বর্তমান বিজ্ঞানকে বিনাশকারী ভোগবাদী মার্গে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন -

"How can one tell if a being has free will? If One encounters an alien, how can one tell if it is just a robot or it has a Mind of its own? The behavior of a robot would be completely determined, unlike that of a being with free will. Thus one could in principle detect a robot as a being whose actions can be predicted. As we said in Chapter 2, this may be impossibly difficult if the beings large and complex. We can not even solve exactly the equations for three or more particles interacting with eachother. Since an alien the size of a human would contain about a thousand trillion trillion particles even if the alien were a robot, it would be impossible to sole the equations and predict what it would do. We would therefore have to say that any complex being has free will-not as a fundamental feature, but as an effective theory, admission of our inability to do the calculations that would enable us to predict its actions." (The Grand Design - P. 178)

এখানে পাঠক ভাবুন যে, যদি Thousand trillion trillion particles -ই বুদ্ধি, ইচ্ছার উৎপত্তির কারণ হতে পারে, তবে কি রোবটের মধ্যে এত কণা হয় না? সেটিও তো সেই মূলকণা দ্বারা নির্মিত হয়েছে, যারদ্বারা আমাদের শরীর নির্মিত হয়েছে। অণুর স্তরের উপরেই ভেদ রয়েছে, অন্যথা প্রায়শই পরমাণুর স্তরে কোনো ভেদ নেই, মূলকণা স্তরে তো নিতান্ত সমানতা রয়েছে। তাহলে কিভাবে কণার সংখ্যা মাত্রের কারণে ভেদকে মেনে নেন আর জীবের ব্যবহারকে কেবল এই আধারে অজ্ঞায় বলে দেন? আজ একটি মানুষ অনেক স্বচালিত রোবটের নির্মাণ করতে পারে কিন্তু অনেক রোবটস্ মিলেও বিনা মানুষের প্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণে একটা মানুষ তো কি, স্বয়ং একটি রোবটের নির্মাণও কি করতে পারবে? এই অবৈজ্ঞানিকতা ও

দম্ভপূর্ণ পুস্তকে জন্ম, মরণ, ইচ্ছা আদিকে যে প্রকারে বোঝানো হয়েছে, তা বাস্তবে হকিং সাহেবকে বৈজ্ঞানিকের স্থানে এক প্রতিক্রিয়াবাদী দুরাগ্রহী (একগুঁয়ে) নাস্তিক দার্শনিকের রূপে প্রস্তুত করেছে। এটিকে পড়ে আমার মনে এনার প্রতি যা সম্মান ছিল, তা প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। ওনার প্রত্যেক তর্কের উত্তর সরলতার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই গ্রন্থে জীবের সত্তার (অস্তিত্বের) সিদ্ধি আবশ্যক নয়, তবুও এখানে আমি সংক্ষেপে কিছু বিচার রাখবো।

রোবটে ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ এসব কোনো গুণ হয় না। সেটি কোনো মনুষ্য দ্বারা নির্মিত ও সঞ্চালিত হয়। অন্যদিকে যেকোনো জীবিত প্রাণী কোনো অন্য দ্বারা সঞ্চালিত হয় না, বরং প্রত্যেক কর্ম করতে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। আজ হকিং সাহেবের মতো যেকোনো বৈজ্ঞানিক ইচ্ছা, জ্ঞান আদি গুণ দ্বারা যুক্ত ব্যবহারের কথিত ব্যাখ্যা করে জীবাত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকারের চেষ্টা করছে, তারা বস্তুতঃ এইপ্রকারের যে, যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো রাঁধুনির দ্বারা রান্না করা ব্যঞ্জনের ব্যাখ্যাতে আগুন, জল, আটা, চিনি, দুধ, ঘী, করাই, চামুচ আদি সব কিছুর কাজের কথা বলছে, এই খাদ্য পদার্থে নানা পরিবর্তনের রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলছে কিন্তু রাঁধুনির চর্চাই করছে না, বরং তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। এরকম কথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাস্তবে অবৈজ্ঞানিক ও দুরাগ্রহপূর্ণই হয়ে থাকে।

এসব বৈজ্ঞানিক এইভাবে এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করার সময় তার নির্মাতা, নিয়ন্ত্রক বা সঞ্চালক অসীম বুদ্ধি ও বল দ্বারা সম্পন্ন চেতন পরমাত্মা তত্বের শুধু উপেক্ষাই করে না, বরং তার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জোর লাগায়। আমি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিকদের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোর প্রশংসা করবো, নিশ্চয়ই তারা মূল ভৌতিকীর ক্ষেত্রে সতত গম্ভীর অনুসন্ধান করছে আর করাও উচিত কিন্তু তারা এই সম্পূর্ণ উপক্রমে চেতন নিয়ন্ত্রক, নিয়ামক তত্বকে সর্বথা উপেক্ষিত করে দেয়, এটাই হল কারণ যে, বিজ্ঞান বর্তমান মূল ভৌতিকীর অনেক সমস্যাগুলোকে আজ পর্যন্ত সমাধান করতে পারেনি। আর এই কারণে বিজ্ঞানের History of the time এর মধ্যে ভারী মাত্রায় ভুল রয়েছে, ঊর্জা - দ্রব্য সংরক্ষণের ভঙ্গ হওয়ার সমস্যা রয়েছে, "**কেন**" ও "**কি**" এর মতো প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে পাওয়ার সমস্যা রয়েছে, বস্তুতঃ সর্বত্র সমস্যাই সমস্যা রয়েছে।

এসব লেখার অভিপ্রায় হল এটাই যে, সম্পূর্ণ জড় জগতে যেসব বল ও গতি বিদ্যমান রয়েছে, সেসবের পিছনে চেতন ঈশ্বর তত্বেরই মূল ভূমিকা রয়েছে। আবার প্রাণীদের শরীরে আত্মার ভূমিকা থাকে। প্রত্যেক গতির পিছনে কোনো না কোনো বলের ভূমিকা থাকে। কেবল বলের ভূমিকা দ্বারা গতি যদৃচ্ছয়া, নিষ্প্রয়োজন এবং অব্যবস্থিত হবে কিন্তু সৃষ্টি হল এক ব্যবস্থিত, বুদ্ধিগম্য ও সপ্রয়োজনীয় রচনা, এই কারণে এরমধ্যে বলের সঙ্গে মহতী প্রজ্ঞারও ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। বল ও বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা, জ্ঞান আদির হওয়া কেবল চেতনের মধ্যেই সম্ভব। সেই চেতন তত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়। এই তত্বের উপর বিচার করাটা বর্তমান

বিজ্ঞানের সামর্থ্য নেই, এই জন্য বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের ভৌতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র, যেখানে ঈশ্বর, জীব রূপী সূক্ষ্মতম চেতন তত্ব এবং প্রকৃতি, মন, প্রাণ, আদি সূক্ষ্মতর জড় পদার্থের বিচার করা হয়, এর উপরেও চিন্তন করা উচিত, এরদ্বারা বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞানের অনেক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সহায়তা পাবে।

পঞ্চাবয়ব দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি

মহর্ষি গৌতম কোনো সিদ্ধান্ত (Theory) নিরূপণের উপায়ে পাঁচ অবয়ব বলেছেন -

"**প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যাবয়বাঃ**" (ন্যায়দর্শন ১|১|৩২)

অর্থাৎ - এই পাঁচ অবয়ব হল এইরকম -

(১) প্রতিজ্ঞা= গতি হল অনিত্য।

(২) হেতু= কারণ আমরা এটিকে উৎপন্ন ও নষ্ট হতে দেখি।

(৩) উদাহরণ= যেরকম সংসারে জড় পদার্থ বা চেতন প্রাণীদের দ্বারা নানা প্রকারের গতি উৎপন্ন হতে দেখা যায়, তার সঙ্গে সেই গতির বিরামও চেতন দ্বারা হতে দেখা যায়।

(৪) উপনয়= সেই প্রকারে অন্য গতিও হল অনিত্য।

(৫) নিগমন= সব দৃষ্ট বা অদৃষ্ট গতি হল অনিত্য।

গতির অনিত্যতার সিদ্ধির সঙ্গে এই প্রকার গতির পিছনে চেতন কর্তার অস্তিত্বের সিদ্ধি করে -

(১) প্রতিজ্ঞা= গতি মূলতঃ চেতনের বল দ্বারা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

(২) হেতু= আমরা জগতে বিভিন্ন গতিকে বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হতে দেখি।

(৩) উদাহরণ= যেরকম আমরা স্বয়ং নানা গতিকে উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকি।

(৪) উপনয়= সেই প্রকারে অন্য গতি, যার কোনো প্রেরক ও নিয়ন্ত্রক সাক্ষাৎ দেখা যায় না, সেটিও কোনো অদৃষ্ট চেতন তত্ব (ঈশ্বর আদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রেরিত হয়ে থাকে।

(৫) নিগমন= সব প্রকারের গতিকে উৎপন্ন, প্রেরিত ও নিয়ন্ত্রণকারী কোনো না কোনো চেতন তত্ব (ঈশ্বর অথবা জীব) অবশ্যই হয়ে থাকে অর্থাৎ বিনা চেতন গতি উৎপন্ন, নিয়ন্ত্রিত ও সঞ্চালিত হতে পারে না।

এই প্রকার বল -এর বিষয়ে বিচার করলে -

(১) প্রতিজ্ঞা= প্রত্যেক বলের পিছনে চেতন তত্বের ভূমিকা রয়েছে।

(২) হেতু= কারণ আমরা চেতন প্রাণীর মধ্যে বলের উপস্থিতি দেখি।

(৩) উদাহরণ= যেরকম সংসারে আমরা নানা ক্রিয়ার মধ্যে নিজের বলের ব্যবহার করে থাকি।

(৪) উপনয়= সেইভাবে সৃষ্টিতে যে বিভিন্ন প্রকারের বল দেখা যায়, সেসবের মধ্যে কোনো অদৃষ্ট চেতনের ভূমিকা হয়ে থাকে।

(৫) নিগমন= প্রত্যেক বলের পিছনে কোনো না কোনো চেতনের (ঈশ্বর অথবা জীব) মূল ভূমিকা অবশ্যই থাকে কিংবা সেই বল ওই চেতনেরই হয়ে থাকে। জড় পদার্থের মধ্যে নিজের কোনো বল থাকে না।

এখন বুদ্ধিগম্য কার্যগুলোতে চেতন তত্বের ভূমিকার উপর বিচার করা যাক -

(১) প্রতিজ্ঞা= প্রত্যেক বুদ্ধিগম্য, ব্যবস্থিত রচনার পিছনে চেতন তত্বের ভূমিকা থাকে।
(২) হেতু= কারণ আমরা চেতন প্রাণী দ্বারা বুদ্ধিগম্য কার্য করতে দেখি।
(৩) উদাহরণ= যেরকম আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা নানা প্রকারের কার্যকে সিদ্ধ করি।
(৪) উপনয়= সেই প্রকার সৃষ্টিতে বিভিন্ন বুদ্ধিগম্য রচনার পিছনে ঈশ্বর রূপী অদৃষ্ট চেতনের ভূমিকা থাকে।
(৫) নিগমন= সবপ্রকারের বুদ্ধিগম্য রচনার কিংবা সম্পূর্ণ সৃষ্টির প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে চেতন তত্বের অনিবার্য ভূমিকা থাকে।

এইভাবে সংযোগজন্য পদার্থের অনাদি ও অনন্ত না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গতি, বল ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ রচনার পিছনে চেতন তত্বের অনিবার্য ভূমিকা থাকে। কিছু কার্যতে জীব রূপী চেতনের ভূমিকা থাকে। এই কারণে মহর্ষি বেদব্যাস জী লিখেছেন **"সা চ প্রশাসনাত্"** (ব্র০সূ০ ১|৩|১১) অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির নানা ক্রিয়াগুলো সেই ব্রহ্মের প্রশাসন দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

এইভাবে যেকোনো পদার্থ সূক্ষ্ম কারণ পদার্থের সংযোগ দ্বারাই নির্মাণ হয়, তথা যেটি অন্য কিছু দ্বারা প্রেরিত গতি, বল, ক্রিয়া আদি গুণের দ্বারা যুক্ত হয়, সেই পদার্থ অনাদি হতে পারে না, আবার যে পদার্থ এরকম সূক্ষ্মতম রূপে বিদ্যামান হয়, যার অন্য কোনো কারণ বিদ্যামান নেই, সেটি অনাদি হতে পারে। এতে প্রকট হল যে, মূল প্রকৃতি রূপ পদার্থে যেখানে কোনো গতি আদি গুণ বিদ্যামান থাকে না, সেটি অনাদি হবে। এই অনাদি পদার্থ দ্বারা সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক, নিয়ামক, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তত্ব এই সৃষ্টির রচনা সময়ে সময়ে করতে থাকে। কখনও সৃষ্টি, তো কখনও প্রলয় হতে থাকে। এই সৃষ্টি-প্রলয় চক্রের না তো কখনও আদি আছে আর না কখনও অন্ত। না তো কোনো সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত হতে পারবে আর না প্রলয় কিন্তু এটির চক্র অবশ্যই অনাদি ও অনন্ত হবে।

এইভাবে আমরা Big Bang Theory এবং Eternal Universe এই উভয় মান্যতাকে নিয়ে সৃষ্টির রচয়িতা চেতন ঈশ্বর তত্বের অস্তিত্বের অনিবার্যতাকে সিদ্ধ করেছি। String Theory এবং M-Theory উভয়ই Big Bang এর মধ্যেই বিশ্বাস করে, এই কারণে এটিকে নিয়ে পৃথক্ ভাবে ঈশ্বর তত্বের সিদ্ধির আবশ্যকতা নেই। প্রবুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাবান্ পাঠকদের উচিত যে, তারা তাদের নিজের জিদ, দুরাগ্রহ ও অহংকারকে ত্যাগ করে সত্য বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিক।

সাধারণতঃ ঈশ্বরের অনুভব কেন হয় না?

এখানে আপনি এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, সৃষ্টির বিভিন্ন ক্রিয়াগুলোর কর্তার রূপে আমরা ঈশ্বরের অনুভব কেন করতে পারি না? আসুন এই প্রশ্নটির উপর বিস্তারভাবে বিচার করি -

এখানে আমরা সর্বপ্রথম বিচার করবো যে, কোনো ক্রিয়ার সঞ্চালক বা কর্তার অনুভব কোন-কোন পরিস্থিতিতে হয়?

(১) কর্তা সাকার হলে পরে যে কেউ তার প্রত্যক্ষ করতে পারে।
(২) ক্রিয়ার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি লক্ষণের অনুভব হলেই কর্তার বোধ সহজ হয়।
(৩) কর্তা নিজের মধ্যে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারাও তার কর্তাপনের অনুভব হয়।
(৪) কর্তার অনুভবের জন্য ক্রিয়ার বিবিধ গতিবিধি বা লক্ষণকে জানবার জ্ঞান অনিবার্য।
(৫) কর্তা নিরাকার হলে সিদ্ধান্ত নিরূপণের পাঁচ অবয়বের সম্যগ্ জ্ঞান অনিবার্য।

এখন উপর্যুক্ত বিন্দুগুলোর উপর ক্রমশঃ বিচার করা যাক -

(১) কর্তা সাকার হলে তার প্রত্যক্ষ হওয়া সরল। আমরা সংসারে বিভিন্ন ক্রিয়ার সঞ্চালক, নিয়ন্ত্রক এবং বিভিন্ন বস্তুর নির্মাতাকে প্রত্যক্ষ দেখে থাকি। এতে কোনো সংশয় নেই। সৃষ্টির কর্তা ঈশ্বর তত্ব সাকার না হওয়ায় নেত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। এইভাবে সেটি স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের বিষয় না হওয়ায় রসনা, প্রাণ, ত্বচা ও শ্রোত দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয় না।

(২) সংসারে হতে চলা অনেক ক্রিয়ার প্রারম্ভ ও সমাপ্ত হতে আমরা প্রত্যক্ষ দেখে থাকি, এই কারণে সেই ক্রিয়াগুলোর প্রারম্ভ ও সমাপন কর্তার বোধ সহজভাবেই হয়ে যায়। সৃষ্টির সেই ক্রিয়া, যার প্রারম্ভ হতে অথবা সমাপ্ত হতে, আমরা দেখতে পারি না অর্থাৎ যেসব ক্রিয়াকে আমরা নিজের জন্ম হতে মরণ পর্যন্ত যথাযথ দেখে ও শুনে থাকি, সেসব ক্রিয়ার প্রারম্ভ ও সমাপ্ত হওয়ার বিচার আমাদের মাথায় আসেই না। আকাশের মধ্যে বিভিন্ন লোকের ভ্রমণ, প্রকাশন, অণু বা পরমাণুর গতি আদি আমরা জন্ম থেকেই যেমনটা দেখেছি ও শুনেছি, তেমনটাই এখন পর্যন্ত চলছে আর আমাদের জীবনের অন্তেও সেরকমই হয়ে থাকবে। এই কারণে এটির কর্তা, নিয়ন্ত্রক, সঞ্চালক আদি গুণযুক্ত কোনো চেতন কর্তার সাধারণতঃ কল্পনাও হয় না। যদি কোনো অত্যল্পায়ু জীব কোনো বাহনকে কেবল চলন্তই দেখে, তাকে কখনও বিরাম অবস্থায় না দেখে, তখন তার মনে এই বিষয়ই আসবে না যে, এটিকে কোনো কর্তা চালিয়েছে বা চালাচ্ছে।

(৩) যখন কোনো সাকার কর্তাও যদি কোনো বাহন আদি যন্ত্রের পাশে বসে থাকে কিন্তু নিজের শরীরে কোনো রূপ ক্রিয়াও না করে, তবুও কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর এরকম বোধ হবে না যে সেই কর্তাটি (চালকটি) সেই বাহনটিকে চালাচ্ছে, বরং তাতে তার এরূপ মনে হবে যে বাহনটি স্বতঃই চলছে।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে ক্রিয়ার আদি, অন্ত ও মধ্যতে প্রতিত কারক নানা লক্ষণের জ্ঞান না হবে, ততক্ষণ তার কর্তার বোধ হবে না। কোনো পশুর এটা বোধ হয় না যে, কোনো ব্যক্তি বাস, রেল, উড়োজাহাজ আদি চালায়। সে এই বাহনগুলোকে চলতে ও থামতেও দেখে থাকে, তাতে বসে থাকা চালকটিকেও দেখতে পারে, তারপরও তার এই বোধ হয় না যে সেই চালকটিই এই বাহনটিকে চালাচ্ছে বা থামাচ্ছে।

(৫) উপর্যুক্ত চার বিন্দু সাকার কর্ম দ্বারাই সম্বন্ধিত। যদি কর্তা নিরাকার হয়, তখন সেই স্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিরূপণের সকল পাঁচ অবয়বগুলোকে বোঝার হেতু প্রতিভার হওয়াও অনিবার্য হবে, অন্যথা ঈশ্বর তত্ত্বের অস্তিত্বের বোধ হবে না। বর্তমান বিজ্ঞান কেবল প্রয়োগ, প্রেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্যেই বিশ্বাসী, গণিতীয় ব্যাখ্যাতে বিশ্বাস করে, এই কারণে তাদের ঈশ্বর অস্তিত্বের বোধ হয় না। যেখানে তাদের সীমা সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে তারা বলে দেয় যে, আমরা জানি না। এই কথাটি তো সত্য যে, আপনারা জানেন না কিন্তু আপনাদের কি জানবার চেষ্টাও করা উচিত নয়? আপনাদের এখানে বৈদিক বিজ্ঞান বা দর্শনের আশ্রয় নেওয়াও কি উচিত নয়? আপনারা এটা কেন মনে করেন যে, যেটি বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য, সেটাই সত্য, অন্য সবই মিথ্যা। এই বিষয়ে Richard P. Feynman ঠিকই লিখেছেন -
"Mathematics is not a science from our point of view, in the sense that it is not a natural science. The test of its validity is not experiment. We must incidentally, make it clear from the beginning that if a thing is not science it is not necessarily bad. For example, love is not a science. So, if something is said not to be a science, it does not mean that there is something wrong with it, it just means that it is not a science." (Lectures on Physics - P. 27)
অর্থাৎ যাকে বর্তমান বিজ্ঞানের সীমায় মানা যায় না, সেটা মিথ্যা, এমনটা মানা উচিত নয়। তাকে কেবল এটা বলা উচিত যে এটা বিজ্ঞান নয়।

বস্তুতঃ Feynman মডার্ন সায়েন্সের পরিভাষার আধারেই এটা বলেছেন, তবুও তিনি বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়কে মিথ্যা ও অনাবশ্যক মানেন না। আমি বর্তমান বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়ের পরিভাষাকেই স্পষ্ট করেছি। এখন আমরা বৈদিক দৃষ্টি দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষার উপর বিচার করবো। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী লিখেছেন -
"বিজ্ঞান তাকে বলে যা কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান এই তিনটি দ্বারা যথাযথ উপয়োগে নেওয়া আর পরমেশ্বর হতে তৃণ পর্যন্ত পদার্থের সাক্ষাৎ বোধ হওয়া, তার থেকে যথাযত উপয়োগ করা।"
(বেদ বিষয় বিচার - ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)

এটি সংস্কৃত ভাষ্যতে **"পৃথিবীতৃণমারম্য প্রকৃতিরপর্য়ন্তানাম্ পদার্থানাম্ জানেন য়থাবদুপকাগ্রহণ..."** বলে প্রকৃতি পর্যন্ত অর্থাৎ স্থূলতম থেকে সূক্ষ্মতম পদার্থের যথাযত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলেছেন। এটির মধ্যে ঈশ্বর ও জীবেরও যথার্থ জ্ঞান সম্মিলিত রয়েছে। এই যথার্থ জ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত করা যাবে, এই বিষয়ে বলেছেন যে, জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা দ্বারা যথার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এর তাৎপর্য হল সত্যশাস্ত্রের গম্ভীর অধ্যয়নের পশ্চাৎ তাকে কর্ম অর্থাৎ প্রয়োগ, প্রেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা পুষ্ট করা, যাকে আজকের বিজ্ঞানও স্বীকার করে। যে বিষয় প্রয়োগ বা প্রেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ বা সাক্ষাৎ হয় না, তার জন্য উপাসনাকে বিশেষ সাধন রূপ বলা হয়েছে। য়োগ সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি বৈদিক ঋষিগণের বিশিষ্ট দান, যার বলের উপর সেই ঋষিগণ সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে জীব ও ঈশ্বরের মতো নিরাকার চেতন পদার্থের সাক্ষাৎ করে যথার্থ বিজ্ঞানকে প্রাপ্ত করেছিলেন। এই জ্ঞান প্রায়শই নির্ভুল হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই প্রাপ্ত যথার্থ বিজ্ঞানকে সেই ঋষিগণ কল্প সূত্র, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, মনুস্মৃতি, ষড়দর্শন, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত আদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই য়োগীজন তাদের নিজের উপাসনা=সমাধির দ্বারা সুবিশাল-লোক লোকান্তর থেকে সূক্ষ্ম মূলকণা ও ক্বান্টাজ্ এবং এটির থেকেও সূক্ষ্ম প্রাণছন্দ ও মরুদ্ আদি পদার্থের মধ্যে নিজের মন বা বুদ্ধিতত্বকে প্রবিষ্ট করিয়ে তার অনুভব বিনা কোনো বাহ্য টেকনিকে করতেন। এরও আগে তাঁরা স্বয়ং নিজের আত্ম স্বরূপ এবং সর্বসূক্ষ্ম ও অনন্ত তত্ব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভব করতেন। এইভাবে বৈদিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বর্তমান বিজ্ঞানের অপেক্ষায় অনেক ব্যাপক। আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান করার সময় মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের য়োগদৃষ্টি দ্বারা জেনে যাওয়া সৃষ্টির গূঢ় রহস্যগুলোকে স্বয়ং অনুভব করেছি। আশ্চর্য হয় যে, কিভাবে মহর্ষি ভগবন্ত তাঁর নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও গম্ভীর রহস্যগুলোকে সাক্ষাৎ করতেন। এই অন্তর্দৃষ্টিও বিনা ঈশ্বরের কৃপায় পাওয়া যায় না। এই সম্পূর্ণ গ্রন্থে ঈশ্বরীয় সত্তার সংকেত দেওয়ার মতো অনেক প্রসঙ্গ এরপরে তুলে ধরা হবে।

• **সৃষ্টিকর্তা -** এই সৃষ্টির রচয়িতা, নিয়ন্ত্রক ও সঞ্চালকের রূপে চেতন তত্ব ঈশ্বর সিদ্ধির উপরান্ত আমরা এটা বিচার করবো যে, সেটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সিদ্ধ করা ঈশ্বরটি স্বয়ং কিরকম? এর উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা যাক -

• **সত্ স্বরূপ -** সর্বপ্রথম সেই ঈশ্বরটি নিত্য হতে হবে। যদি সেই ঈশ্বর অনিত্য হয়ে যায়, তখন তাকে নির্মাণকারী কেউ তাঁর থেকেও মহতী চেতন সত্তা বিদ্যামান হতে হবে, যেটি কোনো অনিত্য ঈশ্বর নামক পদার্থকে উৎপন্ন করতে পারে। যদি এরকমটাও হয়, তাহলে সেই মহতী চেতন সত্তা অবশ্যই অনাদি, নিত্য হতে হবে। যদি এরকমটা না মানা হয়, তবে সেই অনাদি চেতন সত্তাটিকেই ঈশ্বর নাম দেওয়া হবে, নাকি অনিত্য সত্তাটিকে অনাদি মানা হবে। এই কারণে ঈশ্বর সত্ স্বরূপ সিদ্ধ হয়ে থাকে। ধ্যাতব্য হল যে,

যেকোনো চেতন সত্তা কখনও কারও দ্বারাই নির্মাণ সম্ভব নয় আর না স্বয়ং নির্মিত হয়, বরং সেটি নিশ্চিত রূপে অনাদিই হয়ে থাকে।

• **চিত্ স্বরূপ -** সেই ঈশ্বর সত্ স্বরূপ হওয়ার সাথে চেতনও হতে হবে, কারণ কেবল চেতন সত্তাই ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রয়ত্ন এই তিনটি গুণে যুক্ত হয়ে নানা প্রকারের রচনাকে সম্পাদিত করতে পারে।

• **আনন্দ স্বরূপ -** এর সঙ্গে সেই সত্তাটি আনন্দ স্বরূপও হতে হবে। এর কারণটি হল যে, সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নির্মাণে তাঁর কিঞ্চিৎও ক্লেশ, দুঃখ আদি যেন না হয়। যদি সেই সত্তাটি দুঃখ ও ক্লেশে যুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সেটি সৃষ্টি রচনার মতো মহান্ কর্মকে করতে পারবে না। এইজন্য ঈশ্বর তত্ত্বের পরিভাষা করে মহর্ষি পতঞ্জলি জী বলেছেন -

"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"(য়োগ দর্শন ১|২৪)

অর্থাৎ - অবিদ্যাদি ক্লেশ, পাপ-পুণ্য আদি কর্ম এবং তার ফল, বাসনা হতে পৃথক্ পুরুষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে শয়নকারী অর্থাৎ ব্যাপ্ত বিরাজমান চেতন তত্বটিকে ঈশ্বর বলে। এইকারণেই তিনি হলেন সর্বদা আনন্দ স্বরূপ। এইজন্য মহর্ষি দয়ানন্দ ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলেছেন।

• **সর্বব্যাপক -** আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টিতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রায় দুই অরব গ্যালাক্সিকে দেখেছে বা অনুভব করেছে। আমাদের গ্যালাক্সিতেই প্রায় দুই অরব তারা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক এখন পর্যন্ত দেখা ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিজ্যা 10^{26} m -কে মানছে। দুই গ্যালাক্সির মাঝে কয়েক অরব-খরব কিলোমিটার ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো লোক হয় না, তবুও সম্পূর্ণ রিক্ত স্থানের মধ্যে সূক্ষ্ম হাইড্রোজেন গ্যাস অত্যন্ত বিরল অবস্থাতে ভরা থাকে। তারমধ্যেও Vaccum Energy ভরা থাকে। সারাংশ হল এটা যে, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে নিতান্ত রিক্ত স্থান কোথাও নেই। এরমধ্যে আমাদের সূর্যের থেকে কয়েক কোটি গুণ বড় তারাও বিদ্যমান রয়েছে, তাই সূক্ষ্ম লেপ্টন, ক্বার্ক এবং ক্বান্টাজ্ও বিদ্যমান রয়েছে। এর অতিরিক্ত এরথেকেও সূক্ষ্ম প্রাণ, ছন্দ ও মনতত্বাদি পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে। এরথেকেও স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে গতি ও বলের বিদ্যামানতা রয়েছে। সবার মধ্যে সৃজন ও বিনাশের খেলা হচ্ছে। এর কারণ যেখানে-যেখানে এই খেলা চলছে, সেখানে-সেখানে ঈশ্বর তত্বটিও বিদ্যমান হতে হবে। এটির আশয় হল যে, ঈশ্বর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে তথা স্থূল থেকে স্থূলতম পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। এই কারণে কঠ উপনিষদের ঋষি বলেছেন -

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (কঠ০ উপ০ ২|২০)

অর্থাৎ - সেই পরমাত্মা হল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম আর মহান থেকে মহান্। এই কারণে তিনি হলেন সর্বব্যাপক।

য়জুর্বেদ বলছে -

ইশাবাস্যমিদঁ সর্বম্ য়ত্কিঞ্চ জগত্যাম্ জগত্" (য়জু০ ৪০|১)

অর্থাৎ - সেই ঈশ্বর এই সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত হয়ে তাকে আচ্ছাদিত করে আছে। এই প্রকারে সেই ঈশ্বর সর্বব্যাপক সিদ্ধ হচ্ছে। সেটি একদেশী কখনও হতে পারে না।

• **সর্বশক্তিমান্ -** এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে বানাতে, চালাতে ও নিয়ন্ত্রিতকারী সর্বব্যাপক ঈশ্বর তত্ব সর্বশক্তিমানই হতে হবে। আজকের বিজ্ঞান এই বিষয়ে অবগত যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডটি কত বড়? সূক্ষ্ম কণা হতে বিশাল লোকের রচনা করা, তাতে গতি প্রদান করা, সকল বল ও ঊর্জাকেও বল ও ঊর্জা প্রদান করা, কোনো সামান্য শক্তিশালী তত্বের সামর্থ্য নয়, এই কারণে সেই ঈশ্বর তত্বটি সর্বশক্তিমানই হতে পারে। এখানে ধ্যাতব্য হল যে, "সর্বশক্তিমান" এর অর্থ এটা নয় যে ঈশ্বর বিনা কোনো উপাদান পদার্থে শূন্য হতে সৃষ্টি রচনা করতে পারে অথবা সে বিনা কোনো নিয়মে চমৎকার পূর্বক যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তার কাছে যেকোনো কাজ করা অসম্ভব নয়, এরকম কথন উচিত নয়। ঈশ্বর হলেন স্বয়ং নিয়ামক, যিনি নিজেরই নিয়মের অনুসারে কাজ করতে পারেন, অন্যথা কাজ করতে পারেন না। তাঁর সর্বশক্তিমত্তা তো এই বিষয়ে যে তিনি এত বড় সৃষ্টিকে বিনা কারও সহায়তায় রচনা করেন, চালনা করেন ও সঠিক সময়ে তার প্রলয়ও করেন।

• **নিরাকার -** এখন এই বিষয়টির উপর বিচার করা যাক যে, যেই পদার্থটি সর্বশক্তিমান্ অর্থাৎ অনন্ত ঊর্জা ও বল দ্বারা যুক্ত এবং সর্বব্যাপক হবে, তার আকারটি কেমন হবে? আমি মনে করি যে, এই বিষয়টিতে সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এটাই বলবে যে সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান সত্তাটির কোনো আকারই হবে না। বস্তুতঃ ঊর্জা ও বলের মতো গুণ কোনো সাকার পদার্থে হয়ই না। এই সংসারে সাকার পদার্থের মধ্যে যেসব বল বা ঊর্জা দেখা যায়, তা বস্তুতঃ সেই সাকার পদার্থটির ভিতর বিদ্যমান অন্য নিরাকার পদার্থেরই হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিশাল বা লঘু যন্ত্রতে বিদ্যুৎ, যেটি নিরাকারই হয়, আদির বল বিদ্যমান থাকে। প্রাণীর শরীরের মধ্যে চেতন জীবাত্মারও বল কাজ করে। নিরাকার বিদ্যুৎ আদি পদার্থের মধ্যে চেতন পরম তত্ব ঈশ্বরের বল কাজ করে, এটি আমি পূর্বেই বলেছি। যে ঈশ্বর তত্বটি প্রত্যেক সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে তাতে বল ও ঊর্জা প্রদান করছে, সেটি কেবল নিরাকারই হতে পারে, সাকার কখনও নয়।

• **সর্বজ্ঞ -** ঈশ্বর তত্বের সর্বশক্তিমত্তার পশ্চাৎ তাঁর সর্বজ্ঞতার উপর বিচার করা যাক। এটি সামান্য বুদ্ধির বিষয় যে, আধুনিক জগতে এক একটি যন্ত্র নির্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার তথা ব্রহ্মাণ্ডের কিছু রহস্যের জ্ঞানী একজন বৈজ্ঞানিককে অনেক বুদ্ধিমান মানা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা আর চালনা করে, সে কত জ্ঞানী হবে? বস্তুতঃ সেই ঈশ্বরই হলেন সর্বজ্ঞ। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড যাকে জানার চেষ্টা, এই ভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানব কোটি-কোটি বর্ষ থেকে করে আসছে আর যতদিন সৃষ্টি থাকবে, তারা এরকম চেষ্টা করতেই থাকবে কিন্তু তাঁকে কখনও পূর্ণতঃ জানতে পারবে না। যে এরকম ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেছে, যে এটিকে চালাচ্ছে, সেটি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানী হবে।

• **পবিত্র -** এরকম ঈশ্বর কখনও সৃষ্টির উপাদান কারণ রূপ পদার্থে মিশ্রিত হয় না, এইজন্য তাঁকে পবিত্রও বলা হয় অর্থাৎ সেটি সর্বদা বিশুদ্ধ রূপে বিদ্যমান থাকে, এই কারণে ঈশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ মানা হয়, অন্যদিকে প্রকৃতি রূপী মূল পদার্থ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ মানা হয়, এটাই বাস্তবতা। এরসঙ্গে তথ্য এটাও যে, ঈশ্বর কখনও কোনো প্রকারে দোষ দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও গ্রস্ত হতে পারে না।

• **সর্বাধার -** এরকম সেই ঈশ্বরটিই ব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ, চালনা করে তাকে ধারণও করে আছেন, এই কারণে তাঁকে সর্বধার বলা হয়। বর্তমান বিজ্ঞান এটির ধারণাকে গুরুত্বাকর্ষণ বল এবং ডার্ক ম্যাটারের ভূমিকাকে মানে। এটা সত্যিই কিন্তু এই ধারক পদার্থের ধারক তত্ত্বটিই হল স্বয়ং ঈশ্বর।

• **ন্যায়কারী-দয়ালু -** এরকম সেই ঈশ্বর তত্ত্বটি সর্বদা সর্বথা নিশ্চই পূর্ণ ও তৃপ্ত বা অকাম হতে হবে। তখন তিনি এই সৃষ্টির রচনা স্বয়ংয়ের জন্য নয় বরং অন্য কারও অপূর্ণকাম চেতন তত্ত্বের উপভোগ ও মোক্ষ হেতু করেন। সেই অপূর্ণকাম চেতন তত্ত্বটিকেই জীবাত্মা বলে। এখানে "অপূর্ণ" অর্থে এটা বোঝা উচিত যে সেটি বল, জ্ঞান ও আয়তন আদির দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অপেক্ষায় অত্যন্ত লঘু। কারণ সেই ঈশ্বর নিজের জন্য কিছুই চান না, বরং জীবের ভালোর জন্যই সৃষ্টির রচনা করেন, এই কারণে তাঁকে দয়ালু বলে। তিনি সর্বদা জীবদের তাদের কর্মের অনুসারে ফল দেন, না তার অধিক আর না ন্যূন, এই কারণে তাঁকে ন্যায়কারীও বলে। কর্মানুসার ফল পাওয়া চেতন পদার্থ জগতে কারণ কার্যের নিয়মের সমান। জড় জগতে আমরা সর্বত্র কারণ কার্যের নিয়ম দেখে থাকি। বর্তমান বিজ্ঞানও জড় জগতে কারণ কার্যের নিয়মকে স্বীকার করে। Arthur Beiser লিখেছেন -
"cause and effects are still related in quantum mechanics, but what they concern needs careful interpretation" (Concepts of Modern Physics - P.161)

যখন জড় জগতে কারণ-কার্যের নিয়ম সর্বত্র কাজ করে, যদিওবা তাকে আমরা পূর্ণতঃ বুঝতে না পারি, তাহলে সেটি চেতন জগতে কেন কাজ করবে না? আমার মত হল এই যে, এখানে কর্মফল ব্যবস্থাই কারণ কার্যের নিয়মের রূপে কাজ করে। আমরা এটিকে পূর্ণতঃ কখনও জানতে পারবো না। ঈশ্বরও এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষিত করতে পারবেন না। তাঁর প্রার্থনা, উপাসনা আদি করলেও তিনি কোনো জীবের কর্মের অনিষ্ট ফল থেকে সেই জীবকে বাঁচাতে পারবেন না, এখানেই তাঁর ন্যায় ও দয়া উভয়ই সমাহিত রয়েছে। যদি প্রার্থনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি জীবদের তাদের পাপের দণ্ড না দেন, তবে তাঁর সম্পূর্ণ কর্মন্যায় ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। কোনো অপরাধীর অপরাধকে ক্ষমা করে দেওয়াটা ন্যায়াধীশের (বিচারকের) ন্যায় নয় বরং অন্যায়ই হবে। এই ক্ষমার দ্বারা সেই অপরাধী পাপ করার হেতু আরও প্রোত্সাহিত হবে তথা এরফলে সে অনেক জীবের আরও অধিক দুঃখ দিতে পারে, যারফল স্বয়ং ন্যায়াধীশকেও (বিচারককেও) ভুগতে হবে

কিংবা তিনিও সেই পাপের উত্তরদায়ী হবে। এই কারণে সত্য বিচারক কখনও কোনো অপরাধীকে ক্ষমা করেন না আর এটা করা উচিতও নয়। যখন কোনো সত্য বিচারক এরকমটা করেন না, তাহলে সেই পরমাত্মা রূপ বিচারক কেন কারও অপরাধকে ক্ষমা করে নিজের ন্যায় ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করবেন? ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা হল প্রণত ব্যবস্থিত ও স্বাভাবিক, তাতে কখনও কোনো স্খলন হয় না। এই কারণে যারা ঈশ্বরবাদী প্রার্থনা, য়াগ, তৌবা, confession আদি দ্বারা নিজেদের পাপমোচনের কামনা করেন, তারা ঈশ্বর তত্ত্বের বিশুদ্ধ স্বরূপকে বোঝেন না। পাপের ফলের বিষয়ে মহাদেব শিব ভগবতী উমাকে বলেছেন -

"দ্বিধা তু ক্রিয়তে পাপম্ সনিশ্চাসদ্বি চ।
অভিসম্ধায় বা নিত্যমন্যথা বা য়দৃচ্ছয়া।।
অভিসম্ধিকৃতস্পৈব নৈব নাশোকস্তি কর্মণঃ।
অশ্বমেধসহগ্রেশ্চ প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি।।
অন্যথা য়ত্ কৃতম্ পাপ প্রমাদা বা য়দৃচ্ছয়া।
প্রায়শ্চিত্তাশ্বমেধাভ্যাম্ শ্রেয়সা তত্ প্রণস্যতি।"

(মহাভারত অনুশাসন দানধর্ম পর্ব | অধ্যায় ১৪৫ দক্ষিণাত্য সংস্করণ)

এটার মানে হল এই যে, যেসব পাপ প্রমাদ বা অসাবধানী পূর্বক হয়ে যায়, সেসব প্রায়শ্চিত্ত আদি কিছু উপায়ের দ্বারা মুছে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু যেসব পাপ জেনেশুনে বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক করা হয়েছে, সেসব কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এটাই ঈশ্বরের সত্য ন্যায় ও এটাই হল তাঁর সত্য দয়া। দণ্ড দেওয়ার পিছনেও ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে যেন সেই পাপী প্রাণীর পাপের থেকে অন্য প্রাণীদের রক্ষা করা যেতে পারে আর সেই পাপী প্রাণী স্বয়ংও ভবিষ্যতে পাপ কর্মে প্রবৃত্ত না হয়। সেই ঈশ্বর পাপী জীবকে এইভাবে দণ্ড দেন, যেমনটা যোগ্য মাতা-পিতা নিজের সন্তানকে খারাপ থেকে বাঁচানোর হেতু দয়াপূর্বক তাড়ন করেন, নাকি তিনি ক্রোধবশ এরকম করেন। এইভাবে সেই ঈশ্বর হলেন সকল জীবের সবথেকে বড় মাতা-পিতার সমান পালক, ন্যায়কারী ও দয়ালু।

আজ সংসারে এক সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মকে ত্যাগ করে মনুষ্য সমাজ নানা সম্প্রদায়গুলোতে বিভাজিত হয়ে বিভিন্ন ঈশ্বরের কল্পনা করছে। প্রায়শঃই সকল সম্প্রদায় পাপ থেকে মুক্তির কোনো সরল উপায় বলে দেয়। সকলে প্রায়ঃ ঈশ্বরকে পাপ ক্ষমাকারী বলে মনে করে। এতদর্থ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার হেতু বিভিন্ন প্রকারের পূজাডম্বর, নদী স্নান, নাম স্মরণ, কথা স্মরণ, ব্রত, উপবাস, রোজা, প্রার্থনা, নামাজ, নানা মূর্তির, বৃক্ষ পত্র বা পশু আদির পূজা আদি অনেক ধরনের সাধন প্রচারিত করে রেখেছে। এতে পাপ তো ক্ষমা হয় না কিন্তু এই আড়ম্বরের প্রচারকদের আজীবিকা অবশ্য চলছে। এই আড়ম্বর যত মাত্রায় বেড়ে চলেছে, পাপও ততমাত্রাতেই বেড়ে চলেছে। এরফলে সামান্য প্রবুদ্ধ ব্যক্তির বিশ্বাস না কেবল ঈশ্বর ও তাঁর কর্ম ফলের ব্যবস্থা থেকে উঠে যাচ্ছে, বরং নৈতিক মূল্যেরও নিরন্তর ক্ষরণ হতে চলেছে। এই কারণে ঈশ্বরের দয়ালু ও ন্যায়কারী উভয়ই বিশেষণের সমন্বিত বৈজ্ঞানিক স্বরূপ বুঝে নেওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক।

এইপ্রকার ঈশ্বর তত্বটির অনন্ত গুণ, কর্ম, স্বভাব রয়েছে। আমি এখানে কিছু গুণের বিবেচনা করেছি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের দ্বিতীয় নিয়মে ঈশ্বর তত্ত্বের স্বরূপের অত্যন্ত সুন্দর বিবেচনা করে গাগরে সাগর ভরে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন -
"ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজড়, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র আর সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই উপাসনা করা উচিত।"

ঈশ্বরের স্বরূপের এরথেকে সুন্দর বিবেচনা সম্ভবতঃ আর কোথাও নেই। আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন মত সম্প্রদায়গুলোতে ঈশ্বরের মিথ্যা কল্পিত রূপের এরকমই ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভরমার রয়েছে। Stephen Hawking তার The Grand Design নামক পুস্তকটিতে উপহাসপূর্বক ঈশ্বর তত্বকে খণ্ডন করেছেন আর করাও উচিত। যদি Hawking এর সম্মুখ ঈশ্বর তত্বের এই বৈদিক বিজ্ঞান স্বরূপটি বিদ্যমান হতো, তাহলে তাকে ঈশ্বর তত্বের মান্যতাকে খণ্ডিত করার আবশ্যকতা হতো না। এটা খুবই আশ্চর্য যে, কোনো ঈশ্বরবাদীই Hawking এর বিচারকে পড়ে ঈশ্বরের সত্য স্বরূপকে জানার হেতু প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়নি, বরং ঈশ্বরের সত্তাটিকেই অস্বীকারের উপর জোড় দেওয়া হয়। আশা করি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আমার ঈশ্বর বিষয়ক এই প্রকরণটি থেকে ঈশ্বরীয় সত্তা ও স্বরূপের অবশ্যই বোধ হবে আর তারা Hawking এর মতো ভুল পুনরাবৃত্তি করবেন না।

ঈশ্বরের কাজ করার প্রণালী

ঈশ্বরীয় সত্তাটির অস্তিত্ব ও স্বরূপের বৈজ্ঞানিকতা আলোচনার পর আমরা এই বিষয়ের উপর বিচার করবো যে, ঈশ্বর এই সৃষ্টির রচনা, সঞ্চালন, ধারণ ও প্রলয় আদি প্রক্রিয়াগুলোতে নিজের কি ও কিরকম ভুমিকা পালন করেন অর্থাৎ তাঁর কার্যপ্রণালী - ক্রিয়াবিজ্ঞানটি ঠিক কিরকম? সারা বিশ্বের ঈশ্বরবাদী নানা প্রকার দ্বারা ঈশ্বরের আলোচনার তো করে কিন্তু এই বিষয়ের উপর বিচারও করে না যে সেই ঈশ্বরটি তাঁর নিজের কার্যকে কিভাবে সম্পন্ন করেন? আমরা জানি যে এই সৃষ্টিতে যেসব ক্রিয়াই হচ্ছে, তার পিছনে চেতন তত্ব ঈশ্বরের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া প্রাণীদের শরীরে জীবাত্মা রূপী চেতন তত্বেরও ভূমিকা রয়েছে। আমরা এখানে ঈশ্বর তত্ব ভূমিকার চর্চা করবো। ঈশ্বর কি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কণা, ক্বান্টা আদি থেকে শুরু করে বড়-বড় লোক লোকান্তরের ঘূর্ণন ও পরিক্রমণ, তাদের ধারণ, আকর্ষণ, প্রতিকর্ষণ বলের প্রত্যক্ষ কারণ? না, ঈশ্বর সূর্যাদি লোকগুলোকে ও ইলেকট্রন্স আদি কণাগুলোকে ধরে ঘোড়ান না বা চালান না, বরং এইসব পদার্থ সেই বিভিন্ন বল, যাকে বর্তমান বিজ্ঞান জানে বা জানার চেষ্টা করছে, এরদ্বারা নিজ-নিজ কার্য করছে। হ্যাঁ, এইসব বলের উৎপত্তি যেসব প্রাণ ও ছন্দাদি পদার্থ দ্বারা হয়েছে, তাকে বর্তমান বিজ্ঞান এতটুকুও জানে না। এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত মূলবলের উৎপত্তি এবং ক্রিয়াবিধির সমুচিত ব্যাখ্যা করতে এই বিজ্ঞান অক্ষম। এই মূলবলের উৎপত্তি এবং নিয়ন্ত্রণ এই বিবিধ প্রকারেরই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির দ্বারা হয়ে থাকে। বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত নয়, এই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিও মন এবং সূক্ষ্ম বাক্ তত্বের মিথুন দ্বারা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে মন এবং সূক্ষ্ম বাক্ তত্বটির স্বরূপ ও ব্যবহারকে না জেনে প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির এবং তারথেকে উৎপন্ন বিভিন্ন কথিত মূলবলগুলো (গুরুত্ব, বিদ্যুৎ চুম্বকীয়, নাভিকীয় বল এবং দুর্বল বল) এর স্বরূপ ও ক্রিয়াবিজ্ঞানের যথাযত বোধ হওয়া সম্ভব নয়।

ধ্যাতব্য হল যে, মন ও বাক্ তত্বটিও জড় হওয়ার কারণে স্বয়ং কোনো কার্যতে প্রবৃত্ত হওয়ার সামর্থ্য রাখে না। এটিকে প্রবৃত্ত করতে সকলের মূলতত্বটি হল চেতন ঈশ্বর। তিনিই এই মন এবং সূক্ষ্ম বাক্ তত্বটিকে প্রেরিত করেন। এটির মাঝে এক কালতত্বও রয়েছে কিন্তু সেটিও জড় হওয়ায় ঈশ্বর তত্বটি দ্বারা প্রেরিত হয়ে কার্য করে। এইভাবে কার্য করার কিংবা প্রেরক এবং প্রেরিত পদার্থ, নিয়ামক ও নিয়ম্য তত্বের শৃঙ্খলা এই প্রকারে হয় -
চেতন ঈশ্বর তত্বটি কাল তত্বকে প্রেরিত করে। কাল তত্বটি মন-বাক্ তত্বকে প্রেরিত করে, পুনঃ মন এবং বাক্ তত্ব প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিগুলোকে প্রেরিত করে। তারপর সেই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি আধুনিক কথিত চার প্রকারের মূলবলগুলোকে উৎপন্ন ও প্রেরিত করে, তার পশচাৎ সেই চারটি বল (বস্তুতঃ বলের সংখ্যা অনেক অধিক রয়েছে, যা সকল প্রাণাদি রশ্মির কারণেই উৎপন্ন হয়ে থাকে) সমস্ত সৃষ্টিকে উৎপন্ন ও সঞ্চালিত করতে সহায়ক হয়।

এইভাবে ঈশ্বর তত্ত্ব প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় কেবল কাল বা ওম্ ছন্দ রশ্মিকেই প্রেরিত করে, সেটি অগ্রিম প্রক্রিয়াকে আগে বাড়াতে থাকে। এই তত্ত্বটি এতই সূক্ষ্ম যে মনুষ্য কখনও এটিকে কোনোরূপ প্রয়োগ প্রেক্ষণ দ্বারা জানতে পারবে না। কেবলমাত্র উচ্চ কোটির য়োগীই এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে জানতে ও বুঝতে পারবেন। এই গ্রন্থে মহায়োগী মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস এরকম সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে নিজের মহান্ য়োগ বল দ্বারা বুঝে নিয়ে এই মহান্ রহস্যপূর্ণ গ্রন্থটিতে বর্ণিত করেছেন। পরমাত্মার অসীম দয়ায় আমি এই গ্রন্থটিকে বুঝতে সফল হয়েছি। এতে স্থানে-স্থানে ঈশ্বর তত্ত্বের ভূমিকার বর্ণনা কিংবা তাঁর ক্রিয়াবিজ্ঞানের সাংকেতিক বর্ণনা রয়েছে, যাকে পাঠক গ্রন্থের অধ্যয়ন করেই জানতে পারবেন। সারাংশতঃ ঈশ্বর কাল, ওম্ রশ্মি ও প্রকৃতিকে প্রেরিত করে সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে প্রারম্ভ ও সম্পাদিত করেন। তিনি কোনো ক্রিয়াতে জীবাত্মার মতো এরকম অংশীদার হন না যে তাঁকে নিজের কর্মের ফল ভুগতে হবে। তিনি হলেন সর্বদা অকাম। কেবলমাত্র জীবদের জন্যই সবকিছু করেন, এই কারণে তিনিই কর্তা আর তিনিই অকর্তা। তিনি হলেন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বর কিভাবে প্রেরিত করেন? সেই প্রেরণা বা জাগরণের ক্রিয়াবিজ্ঞানটি কি? এসব বিষয় আমি পরবর্তী কালতত্ব প্রকরণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত রূপে বোঝাবো, পাঠক সেখানেই দেখতে পারবেন (এই বিষয়টি আপনি বেদ বিজ্ঞান আলোক গ্রন্থে পড়তে পারেন বা Vaidic Physics youtube channel এ ভিডিও উপলব্ধ রয়েছে, সেটিও দেখতে পারেন)।

অদ্বৈতবাদ সমীক্ষা

এই সংসারে যেখানে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত আদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, সেখানে কিছু আধ্যাত্মবাদী মনে করেন যে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঈশ্বর তত্বের অস্তিত্বই রয়েছে, জীব ও প্রকৃতি আদির কোনো অস্তিত্ব নেই। এইরূপ ভাবনা মধ্যাকালে অনেক আচার্যদের ছিল। এই আচার্যদের মধ্যে আদ্য শঙ্করাচার্যকে প্রমুখ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। অদ্বৈতবাদের আধার মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ব্যাস (মহর্ষি বেদব্যাস) এর ব্রহ্মসূত্র নামক মহত্বপূর্ণ গ্রন্থকে মানা হয়। এই মত বিশ্বের অনেক বৈদিক ও অবৈদিক কিংবা ভারতীয় ও বিদেশী মত মতান্তরদের প্রভাবিত করতো ও করছে। আমরা এসবের আলোচনা না করে কেবল এই বিষয়টির উপর বিচার করবো যে, এই মতটি কেন বেদ বিরুদ্ধ, স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রেরও বিরুদ্ধ তথা বিজ্ঞান এবং যুক্তিরও বিরুদ্ধ? ব্রহ্মসূত্রের প্রথম দুটি সূত্র দ্বারাই অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। সেই সূত্র দুটি হল এই রকম -

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্র০সূ০ ১|১|১)
"জন্মাষস্য য়তঃ" (ব্র০সূ০ ১|১|২)

এই দুটি সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ক চর্চা প্রারম্ভ করার সঙ্গে বলা হয়েছে -
"এখন আমি ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা করছি। সেই ব্রহ্ম কিরকম এবং কে তিনি? এটা বলার সঙ্গে বলছেন যে যার দ্বারা জগতের জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়াদি) হয়।"

একটু ভাবুন যে, যেই জগতের জন্ম হয়, তাতে স্থিতি হয় তথা সঠিক সময়ে ব্রহ্ম তার প্রলয়ও করে, সেই জগৎ কখনও মিথ্যা হতে পারে না। জানি না কেন, এই ব্রহ্ম প্রতিপাদক মহান গ্রন্থের আধারে ব্রহ্মের অতিরিক্ত অন্য সকল পদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে এই গ্রন্থটি তার প্রারম্ভেই জগতের সকল পদার্থের বাস্তবিকতাকে প্রতিপাদিত করছে। এই বিষয়টি পৃথক্ যে জগৎ ব্রহ্মের মতো নিত্য নয় কিন্তু জগৎ মিথ্যাও (অবাস্তবিকও) নয়। এখানে জীব ও প্রকৃতি রূপী মূল উপাদান কারণের অস্তিত্বেরও নিষেধ নেই। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের বিষয়ে এটা বড় ভারী ভ্রান্তি হয়েছে, এবং হচ্ছে। আমি "ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ওন্ বৈদিক সাইন্সেস" ব্যাঙ্গালোরে আগস্ট ২০০৪ এ অনেক বৈদিক বিদ্বানদের তথা বর্তমান ভৌতিক শাস্ত্রীদের ব্রহ্মসূত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা করতে দেখেছি। অদ্বৈতবাদের শাস্ত্রীয় সমীক্ষা হেতু পাঠকদের মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক ক্রান্তিকারী গ্রন্থ অবশ্যই পড়া উচিত। আমি এখানে তার পিষ্ঠপেষণ করাটা আবশ্যক বলে মনে করি না, বরং আমি এখানে বর্তমান বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে অদ্বৈতবাদের পুষ্টির প্রয়াসের সমীক্ষা অবশ্যই করবো। এই পক্ষের বিদ্বান সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের পদার্থ দ্রব্য ও উর্জার পারস্পরিক রুপান্তরণের চর্চা করে অন্তিমে এই উভয়কে চেতন ঊর্জাতে পরিবর্তনীয় ও তারথেকে উৎপন্ন সিদ্ধ করে। সামান্যতঃ এই বিচারটি বৈজ্ঞানিক সত্যই মনে হয় কিন্তু এটির উপর বিশেষ চিন্তন করলে পরে এটির অসারতা স্পষ্ট হয়ে যায়। সর্বপ্রথম এই বিষয়টির উপর বিচার করুন যে, পরিবর্তনীয়

তত্বটি কে কে হতে পারে? স্পষ্টতঃ যে পদার্থটি বিকারী হয়, সেটাই বিকারে প্রাপ্ত হয়ে রূপান্তরিত হতে সক্ষম হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, বিকারী পদার্থটি কি ও কিরকম হয়? আমার দৃষ্টিতে বিকারী পদার্থটি জড়ই হতে পারে। যদি এক-একটি সূক্ষ্ম কণা বা ক্বান্টাকে জড়ের স্থানে চেতন মানা হয়, তাহলে প্রশ্ন এটা দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক কণা বা ক্বান্টার চেতনা কি পৃথক্-পৃথক্ বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের চেতনা কি একটাই? যদি প্রত্যেক কণার চেতনা পৃথক্-পৃথক্ হয়, তাহলে কিভাবে সারা ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ পদার্থকে এক প্রকারের নিয়মে বাঁধা দেখা যায়? যেভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ঈচ্ছিক ক্রিয়া, বিচার, সংস্কার ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে, সেইভাবে প্রত্যেক কণা ও ক্বান্টাকে যদি চেতন মানা হয়, তবে তাদের ক্রিয়া যে পরস্পর সমানই হবে, এমনটা আবশ্যক নয়। তারা পরস্পর সঙ্গত থাকুক বা না থাকুক সেটাও আবশ্যক নয়। প্রত্যেক কণার পৃথক্-পৃথক্ চেতন সত্তা হওয়ার পরেও তারা পরস্পর মিলে এই সৃষ্টির রচনা হেতু পরস্পর নিজের নানা সমুহ বানাতে পারে আর সম্পূর্ণ সৃষ্টির অসংখ্য নিয়মকেও বানাতে পারে, এটা সর্বথা অসম্ভব। এমনটা কোনো প্রাণীও করতে পারবে না। সর্বাধিক বুদ্ধিমান প্রাণী যাকে মানব বলে সেই প্রাণী মনুষ্য নিজের সমাজের নির্মাণ করে কিন্তু সেই সমাজের গঠন এরকম জটিল হয় না, যেমনটা বিভিন্ন জড় পদার্থের মধ্যে সেই পদার্থের অবয়বভূত সূক্ষ্মকণা বা ক্বান্টাজ নির্মিত করে। বিভিন্ন প্রাণী তাদের সামাজিক কাঠামোকে সময়ে-সময়ে নিজের-নিজের রুচি ও স্বভাব-সংস্কারের অনুসারে বদলাতে থাকে কিন্তু বিভিন্ন কণা বা ক্বান্টাজের নিয়মে কখনও পরিবর্তন হয় না।

নোট: আমার দৃষ্টিতে আদ্য শঙ্করাচার্য মহারাজ অদ্বৈতবাদি ছিলেন না। তাঁকে বুঝতে তাঁর অনুয়ায়ীরা কিছু ভুল করেছে।

(vaidic-physics.blogspot.com থেকে উদ্ধৃত)

ওতম্ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষম্ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বম্
শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।।
ওতম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।

অনুবাদক : আশীষ আর্য

ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্য়ামী, অজড়, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র আর সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই উপাসনা করা উচিত।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী